এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স

ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

ঊনবিংশতিতম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন

বিশেষ সংখ্যা ২০২৪

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স,
ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

আলো

ঊনবিংশতিতম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য-সম্মেলন
৮-৯ই নভেম্বর, ২০২৪
অলক গুপ্ত—বিশ্বজিৎ মাইতি মঞ্চ
'রবীন্দ্রতীর্থ', নিউটাউন
কলকাতা

বিশেষ সংখ্যা

পত্রিকা উপসমিতি

প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী, চঞ্চল সমাজদার, দেবব্রত ঘোষ,
শুভ্রান্ত ঘটক, সৌমিক চৌধুরী, প্রণবেশ পুরকাইত

সম্পাদক
অম্লান দে

সূচীপত্র

		পৃ.
১.	**আমাদের কথা**	৩
২.	**১৯তম রাজ্য-সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটি**	৪
৩.	**সম্মেলন-পরিক্রমা**	৬
৪.	**AI, তুমি এলে তাই** ... কৃশানু দেব	১৬
৫.	**স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিষেবায় বেসরকারিকরণের প্রভাব**... অম্লান দে	২৭
৬.	**জমি, জল, জঙ্গল—কর্পোরেট লোলুপতা : একটি সমীক্ষা**... দেবব্রত ঘোষ	৩১
৭.	**ভারতের প্রাকৃতিক বিপর্যয়—মনুষ্যসৃষ্ট নাকি প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা**... কানুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৪১
৮.	**ক্রোড়পত্র : শতবর্ষী 'রক্তকরবী' ও 'Red Oleanders'** [সংকলন ও বিন্যাস : পত্রিকা উপসমিতি]	৫১

লেখক-পরিচিতি

১. **কৃশানু দেব** ... সাধারণ সম্পাদক, এ্যাসোয়িসেশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মসঅফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল

২. **অম্লান দে**... সমিতির মুখপত্র 'আলো'র সম্পাদক

৩. **দেবব্রত ঘোষ**... সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

৪. **কানুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়**... সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

'যক্ষপুরী'র জাল-জঞ্জাল ভেদ করে 'রক্তকরবী' ফুটে ওঠার দৃশ্যকল্প রূপায়িত হয়েছে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর আঁকা এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে বিধৃত রঙিন চিত্রটিতে। 'Visva-Bharati Quarterly' পত্রিকার 'Special Sharadiay (Autumn) Number' রূপে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত সংখ্যাটিতে আর্টপ্লেটে মুদ্রিত হয়েছিল এই ছবিটি; এই সংখ্যায় 'রক্তকরবী' নাটকের কবিকৃত দ্রুতসাধিত ইংরেজি অনুবাদ 'Red Oleanders' মুদ্রিত হয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক চিত্রবিভূষিত হয়ে। প্রায় একই সময়ে (আশ্বিন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ইং ১৯২৪ সাল) 'প্রবাসী' পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্ররূপে 'রক্তকরবী' নাটকের প্রকাশ।

'রক্তকরবী' ও 'Red Oleanders' প্রকাশের শতবর্ষ-এই উপলক্ষটিকে স্মরণ করে 'আলো-র বর্তমান সংখ্যাটিতে মুদ্রিত করা হল "শতবর্ষী 'রক্তকরবী' ও 'Red Oleanders"-শীর্ষক একটি ক্রোড়পত্র।"

আমাদের কথা

সংগঠনের সংগ্রাম-আন্দোলনের প্রবহমান ধারায় 'সম্মেলন' যে উত্তুঙ্গতার শিখর স্পর্শ করতে চায়, তার উত্তাপকে ধারণ করেই গত ৮-৯ই নভেম্বর ২০২৪ তারিখে কলকাতার নিউটাউন স্থিত 'রবীন্দ্রতীর্থ'-এ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমাদের প্রিয় সমিতির ঊনবিংশতিতম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য-সম্মেলন। প্রয়াত দুই অগ্রণী নেতৃত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই সম্মেলন-মঞ্চ নামাঙ্কিত হয় **'অলক গুপ্ত—বিশ্বজিৎ মাইতি মঞ্চ'** রূপে। রাজ্য সম্মেলন মঞ্চ মুখর ছিল আমাদের নিজস্ব দাবী-দাওয়া, অধিকার অর্জনের চাহিদায়, অর্জিত অধিকারসমূহ হরণের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদে; একইসঙ্গে দেশ-দুনিয়ার সামগ্রিক পরিবহে সংগ্রাম-আন্দোলনের গতিধারার সঠিক স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের সুচিন্তিত প্রয়াস বিদ্যমান ছিল মাননীয় উদ্বোধক বিশিষ্ট শিল্পী পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি সারা ভারত 'নাবার্ড' কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাণা মিত্র এবং উপস্থিত প্রতিনিধিদের বক্তব্যে।

১৯৮৭ সালের ২৩শে মে, আমাদের প্রিয় সমিতির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ লগ্নের পরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রায় চার-চারটি দশক পেরিয়ে এসেছি আমরা। প্রতিষ্ঠানলগ্নের শপথ আজো আমাদের ভবিষ্যত যাত্রাপথের নির্দেশিকা, জটিলতাময় বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবিলা করার সূত্রসন্ধানে দিগ্‌দর্শিকার ভূমিকা পালন করে চলেছে।

যে 'আলোপৃথিবী' গড়ার স্বপ্নে আমরা প্রাণিত, জীবন ও জগতের যে সংকটের স্বরূপগুলিকে আমরা চিনে নিতে চাই এবং সেই সন্ধানে উত্তরণের দিশা খুঁজি আমাদের সচেতন সংগ্রামী অভিযাত্রায় তারই সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নির্বাচিত কয়েকটি লেখা স্থান পেয়েছে বর্তমান সংখ্যার পরিসরে। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' ও তার ইংরেজি অনুবাদ 'Red Oleanders' প্রকাশের শতবর্ষ উপলক্ষে এই বিশেষ সংখ্যাটিতে মুদ্রিত করা হল 'শতবর্ষী রক্তকরবী' ও 'Red Oleanders' শীর্ষক একটি ক্রোড়পত্র।

নানা কারণে এই বিশেষ সংখ্যাটির মুদ্রণকার্যে অনেকটাই বিলম্ব ঘটেছে, তার জন্য আমরা দুঃখিত। সম্মেলন-স্মরণিকা প্রকাশের লগ্নে ঊনবিংশতিতম রাজ্য-সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে যে-সমস্ত সুধীজন ও শুভানুধ্যায়ীরা আমাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেছেন, অকৃপণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের দিকে তাঁদের পুনর্বার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। সমস্ত সহযোদ্ধা বন্ধুদের জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল

ঊনবিংশতিতম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন

৮-৯ই নভেম্বর, ২০২৪

অলক গুপ্ত-বিশ্বজিৎ মাইতি মঞ্চ

'রবীন্দ্রতীর্থ', নিউটাউন

কলকাতা

অভ্যর্থনা কমিটি

উপদেষ্টা মণ্ডলী—অজিত দত্ত (অবসরপ্রাপ্ত), প্রীতিরঞ্জন অধিকারী (অবসর প্রাপ্ত), শুভ্র দত্ত মজুমদার (উঃ ২৪) অর্ণব চৌধুরী (কলঃ), শ্যামাপদ রায় (কলঃ), নেসার আহমেদ (কলঃ), দেবব্রত ভট্টাচার্য (উঃ ২৪), অমিত চৌধুরী (উঃ ২৪), রাজা বাগ (কলঃ), শান্তা দত্ত (কলঃ), সঞ্জয় মুখার্জি (উঃ ২৪), অলোক সেনাপতি (উঃ ২৪), নিরঞ্জন গায়েন (কলঃ),
পার্থপ্রতিম সাহা (উঃ ২৪)।

সভাপতি— দীপক কুমার সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত)।

কার্যকরী সভাপতি—সুব্রত ঘোষ (উঃ ২৪ পর), দেবপ্রসাদ মুখার্জি (কলঃ)।

সহ সভাপতি—রাজর্ষি পাল (কলঃ), সুদীপ্ত দত্ত (কলঃ), কমলিকা আচার্য্য (উঃ ২৪), জয়ন্তী চক্রবর্তী (উঃ ২৪)

কার্যকরী সম্পাদকদ্বয়—দ্বৈপায়নঘোষ (কলঃ), অপ্রতিমচন্দ (উঃ ২৪)।

যুগ্ম সম্পাদক—সৌরভকান্তি বেরা (কলঃ), সঞ্জয় চক্রবর্তী (উঃ ২৪)।

দপ্তর সম্পাদক—দীপাঞ্জন ঘোষদস্তিদার (কলঃ)। **কোষাধ্যক্ষ**—আদিত্য মজুমদার (কলঃ)।

উপসমিতি

দপ্তর—দীপাঞ্জন ঘোষ দস্তিদার (আহ্বায়ক, কলঃ), শুভজিৎ সান্যাল (কলঃ), বিশ্বরূপ ঘোষ (কলঃ), অমিতাভ ঘোষ (উঃ ২৪), শম্পা প্রধান (উঃ ২৪), সুজয় কুমার পাল (উঋ ২৪)।

অর্থ—আদিত্য মজুমদার (আহ্বায়ক, কলঃ), কৌশিক চ্যাটার্জী (কলঃ), দীপঙ্কর রায় (উঃ ২৪), সৌম্যব্রত দে (উঃ ২৪)।

খাদ্য—হিমাংশু বাউল (আহ্বায়ক, উঃ ২৪), রাজীব শেঠ (উঃ ২৪), সূর্যকান্ত মিদ্যা (উঃ ২৪), জয় নস্কর(উঃ ২৪), মহ হবিবুর রহমান (উঃ ২৪)।

আবাসন—সুদীপ মজুমদার(আহ্বায়ক, উঃ ২৪), সমরজিৎ শেঠ (উঃ ২৪), সুরেশ প্রামাণিক (কলঃ), পুষ্পকরজন দে (উঃ ২৪)।

মঞ্চ ও প্রচার—অঞ্জনা ভট্টাচার্য্য (আহ্বায়ক, কলঃ), নির্মলকুমার হালদার (উঃ ২৪)।

পরিবহন—সঞ্জীব রাজ রাও কুসুমা (আহ্বায়ক, কলঃ), অরিজিৎ ঘোষ (উ ২৪), সঞ্জীব সেন (উঃ ২৪), রাজু বাছার (উঃ ২৪), সুরেশ মণ্ডল (উঃ ২৪)।

স্বাস্থ্য—গোলাম মির্জা, (আহ্বায়ক, উঃ ২৪), নিতীশ প্রামাণিক (উঃ ২৪), দিবাকর বিশ্বাস (উঃ ২৪)।

মহিলা—জারিত দাস (আহ্বায়ক, উঃ ২৪), সুদেষ্ণা রায় (উঃ ২৪), গার্গী কোনার (উঃ ২৪), বিউটি মল্লিক (উঃ ২৪), সায়ন্তী মিস্ত্রী (মণ্ডল) (কলঃ), অস্মিতা দাশগুপ্ত (উঃ ২৪)।

সাংস্কৃতিক—অর্ণব চৌধুরী (আহ্বায়ক, কলঃ), আমিনুল ইসলাম খান (কলঃ)।

মঞ্চ ও প্রচার : নিউটন রায়, অঞ্জনা ভট্টাচার্য

পরিবহণ : ধনঞ্জয় বিশ্বাস, জয়দীপ মল্লিক, ভরত মাইতি

স্বাস্থ্য : অভিজিৎ বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল

মহিলা : জয়ন্তী চক্রবর্তী, জাবিন বারি, সায়ন্তী মণ্ডল

সাংস্কৃতিক : আমিনুল ইসলাম খান, দীপান্বিতা পাল, শতাব্দী সরকার

স্বেচ্ছাসেবক : কমলেশ গায়েন, সৌমেন্দ্রনাথ পাল, সুরেশ প্রামাণিক, দিবাকর বিশ্বাস, অশোক মাহাতো, কুতুবুদ্দিন মণ্ডল, সৌজিৎ সাহা, নীলাঞ্জনা সিন্‌হা, বিশ্বজিৎ হালদার

সম্মেলন পরিক্রমা

প্রথম রাজ্য সম্মেলনঃ ৯-১১ই জানুয়ারী, ১৯৮৮ মৌলালী যুব কেন্দ্র, কলকাতা।
উদ্বোধকঃ রমনীকান্ত দেবশর্মা, বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
প্রধান অতিথিঃ অজয় মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি---অসিতবরণ দাস, সহঃ সভাপতি---দীপক সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক—সুভাষ শিকারী, যুগ্ম-সম্পাদক—নিমাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক—সুকুমার দে, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ—অরবিন্দ মন্ডল, সহ-কোষাধ্যক্ষ—পরেশ পাল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক—ষোড়শী প্রসাদ মিশ্র, দপ্তর সম্পাদক—রাধাচরণ লাহা।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদকগণ

১) অজিত মন্ডল—কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, ২৪ পরগনা (উত্তর) ও ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)।
২) সুভাষ কোঙার—বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া।
৩) অসিত সামন্ত—মালদা, পঃ দিনাজপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ।
৪) গণেশ রায়—দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি।

দ্বিতীয় (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ টাউনহল, বর্ধমান।
উদ্বোধক ঃ মলয় রায়, যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।
প্রধান অতিথি ঃ শুভাশীষ গুপ্ত, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সংগ্রামী হাতিয়ারের সম্পাদক।
বিশেষ অতিথি ঃ সমর বাওড়া, সম্পাদক, সারাভারত কৃষকসভা, বর্ধমান জেলাকমিটি।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দীপক সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি—মনোরঞ্জন চৌধুরী, রাধাচরণ লাহা, সাধারণ সম্পাদক—সুভাষ শিকারী, যুগ্ম সম্পাদক—নিমাই মুখার্জী, সহ-সম্পাদক—অরবিন্দ মন্ডল, সুব্রত ব্যানার্জী, দপ্তর সম্পাদক—অজিত দত্ত, কোষাধ্যক্ষ—সুকুমার দে, সহঃ কোষাধ্যক্ষঃ—পরেশ পাল, পত্রিকা সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদকগণ

১) সুভাষ কোঙার—বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, তমলুক, পুরুলিয়া ২। অরিন্দম বক্সী—মালদা,পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ৩। এরশাদ আলী—কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, ২৪ পরগনা (উত্তর) ও (দক্ষিণ) ৪। গণেশ রায়—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার

৩য় (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ২৪-২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২ বহরমপুর কমার্স কলেজ, মুর্শিদাবাদ।
উদ্বোধকঃ মলয় রায়, যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশেষ অতিথিঃ জয়নাল আবেদিন, কৃষক আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতৃত্ব ও সাংসদ এবং জোহাক আলি, সম্পাদক, সারাভারত কৃষকসভা, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দীপক সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, পরেশ চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক—সুভাষ শিকারী, যুগ্ম-সম্পাদক—যোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সহ-সম্পাদক—অরবিন্দ মন্ডল, সুব্রত ব্যানার্জী, কোষাধ্যক্ষ—সুকুমার দে, সহ-কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক—অজিত দত্ত, সদস্য—মোশারফ হোসেন, বিমল পাল চৌধুরী, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—অরিন্দম বক্সী।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদকগণ

১) অরিন্দম বক্সী—হুগলী, হাওড়া, তমলুক ২। এরশাদ আলী—উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা, নদীয়া ৩। সুভাষ কোঙার—মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ৪। দেবেন মাহাতো—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ৫। সুব্রত চক্রবর্তী—মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, ৬। গণেশ রায়—দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি।

৪র্থ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, অডিও ভিস্যুয়াল হল, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

উদ্বোধক ঃ মলয় রায়, যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দীপক সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, পরেশ চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক—সুভাষ শিকারী, যুগ্ম-সম্পাদক—যোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সহ-সম্পাদক—সুব্রত ব্যানার্জী, মোশারফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, হিসাব রক্ষক—বিমল পাল চৌধুরী, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক—অজিত দত্ত, সদস্যগণ—অরিন্দম বক্সী, মৃণাল চক্রবর্তী, সম্পাদকমন্ডলীর স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্যগণ—সুকুমার দে, অরবিন্দ মন্ডল, দেবেন মাহাতো, পার্থ মুখার্জী, সুভাষ সামন্ত।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদকগণ

১) গণেশ রায়—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চল ২। সুব্রত চক্রবর্তী—উঃ দিনাজপুর, দঃ দিনাজপুর মালদা অঞ্চল ৩। দেবেন মাহাতো—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, তমলুক অঞ্চল। ৪। আব্দুল আরিফ—বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ অঞ্চল ৫। পার্থ মুখার্জী—হাওড়া, হুগলী, নদীয়া অঞ্চল ৬। সুভাষ সামন্ত—কলকাতা, উঃ ২৪ পরগণা, দঃ ২৪ পরগণা অঞ্চল।

৫ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ৯-১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ কমঃ অম্লান সেন মঞ্চ (বিদ্যাসাগর শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়) মেদিনীপুর।

উদ্বোধক ঃ সুশীল ব্রহ্ম, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ তরুণ ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।
বিশিষ্ট অতিথি ঃ বিনয় চৌধুরী, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দীপক সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, পরেশ চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, যুগ্ম সম্পাদক—মোশারফ হোসেন, সহ-সম্পাদক—সুব্রত ব্যানার্জী ও মৃণাল চক্রবর্তী, দপ্তর সম্পাদক—অজিত দত্ত, কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, হিসাব পরীক্ষক—বিমল পাল চৌধুরী, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য—সুভাষ শিকারী, অরিন্দম বক্সী, প্রণব দত্ত, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—দেবেন মাহাতো, সুভাষ সামন্ত, পার্থ মুখার্জী, অরবিন্দ মন্ডল।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। সুভাষ সামন্ত—কলকাতা—দক্ষিণ ২৪ পরগণা—উত্তর ২৪ পরগণা ২। পার্থ মুখার্জী—হাওড়া-হুগলী-নদীয়া ৩। দেবেন মাহাতো—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-তমলুক-মেদিনীপুর ৪। ধনপতি মজুমদার—বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদ ৫। গণেশ রায়—মালদহ-উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৬। সুনীল বর্মণ—দার্জীলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার।

৬ষ্ঠ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ৫-৭ই জুলাই, ১৯৯৮, কমরেড নীরেন চৌধুরী মঞ্চ, রবীন্দ্রভবন, চুঁচুড়া হুগলী।

উদ্বোধক ঃ স্মরজিৎ রায়চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।
প্রধান অতিথি ঃ ডাঃ সুর্যকান্ত মিশ্র, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
বিশিষ্ট অতিথি ঃ তরুণ ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, সহঃ সভাপতি—পরেশ পাল, সুব্রত ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, যুগ্ম সম্পাদক—অজিত দত্ত, সহ সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, সৌমেন চ্যাটার্জী, কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, দপ্তর সম্পাদক—প্রবীর ঘোষ, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, হিসাব রক্ষক—প্রণব দত্ত, সদস্যগণ—সুভাষ শিকারী, মৃণাল চক্রবর্তী, প্রবীর ব্যানার্জীও অর্ণব সাহা, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদসগ্যণ—দীপক সেনগুপ্ত, মোশারফ হোসেন, বিমল পালচৌধুরী, পার্থসারথি মুখার্জী, অলোক গুপ্ত।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। অলোক গুপ্ত—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা ২। পার্থ মুখার্জী-হাওড়া-হুগলী-নদীয়া ৩। দেবেন মাহাতো—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-তমলুক-মেদিনীপুর, ৪। রবিউল ইসলাম—বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদ, ৫। কাদের হোসেন—মালদহ-উত্তর দিনাজপুর, ৬। সুনীল বর্মণ—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার।

৭ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ১৩-১৫ই আগস্ট, ২০০০ সিউড়ি ডি.আর.ডি.এ. হল, বীরভূম
উদ্বোধকঃ সুশীল ব্রহ্ম, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।
প্রধান অতিথি ঃ অজয় মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন।
বিশিষ্ট অতিথি ঃ ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

*

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, সহঃ সভাপতি—সুব্রত ব্যানার্জী, অসীম ব্যানার্জী, সাদারণ সম্পাদক—যোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, যুগ্ম সম্পাদক—অজিত দত্ত, সহ-সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, অর্ণব সাহা, কোষাধ্যক্ষ—সোমনাথ ব্যানার্জী, হিসাব রক্ষক—অসিত কুমার দাস, পত্রিকা সম্পাদক—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক—কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, সদস্য—বিশ্বজিৎ বসু, সমীরণ রায়চৌধুরী, পরিচয় ভট্টাচার্য, ইরশাদ আলি। স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—দীপক সেনগুপ্ত, পার্থসারথী মুখার্জী, অলোকগুপ্ত, সমীরকুমার বসু, প্রণব দত্ত, মৃণাল চক্রবর্তী।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। অলোক গুপ্ত—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা-উত্তর ২৪ পরগনা ২। সমীর বসু-হাওড়া-হুগলী-নদীয়া, ৩। দেবেন মাহাতো-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-তমলুক-মেদিনীপুর ৪। রবিউল ইসলাম-বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদ ৫। কাদের হোসেন—মালদহ-উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬। প্রফুল্ল রায়—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার।

৮ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১০-১১ই মে,২০০২ রবীন্দ্রভবন (অমল বিকাশ দত্ত মঞ্চ) কোচবিহার।

উদ্বোধক ঃ জ্যোতিপ্রাসাদ বসু, যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ তরুণ ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া, পর্যটন মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—নিমাই প্রসাদ মুখার্জী, সহঃ সভাপতি—সুব্রত ব্যানার্জী, দেবেন মাহাতো, অসীম ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক—যোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, যুগ্ম সম্পাদক—অজিত দত্ত, সহ সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, অর্ণব সাহা, কোষাধ্যক্ষ—কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, দপ্তর সম্পাদক—অসিত কুমার দাস, পত্রিকা সম্পাদক—প্রণব দত্ত, হিসাব রক্ষক—অশোক কুমার দেবনাথ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য—পরিচয় ভট্টাচার্য, ঈর্শাদ আলি, বিশ্বজিৎ বসু, সমীরণ রায়চৌধুরী, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দীপক সেনগুপ্ত, অলোক গুপ্ত, সোমনাথ ব্যানার্জী, পার্থসারথী মুখার্জী

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। মৃণাল চক্রবর্তী—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা-হাওড়া-হুগলী। ২। ধনঞ্জয় বিশ্বাস—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা। ৩ কার্তিক ঘোষাল-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া। ৪। ধনপতি মজুমদার—বর্ধমান-বীরভূম ৫। মহম্মদ আলাউদ্দিন—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৬। প্রফুল্ল রায়—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার ৭। সুভাষ বেরা—মালদহ-মুর্শিদাবাদ ৮। নিতাই সামন্ত—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর।

৯ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ২৩-২৫ শে জানুয়ারী, ২০০৪ সরশুনা কলেজ, বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

উদ্বোধক ঃ সুশীল ব্রহ্ম, সহ-সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ অজয় মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি , সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—সুব্রত ব্যানার্জী, সহ-সভাপতি—অসীম ব্যানার্জী, ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সমীর বসু, সাধারণ সম্পাদক—অজিত কুমার দত্ত, যুগ্ম-সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, সহ-সম্পাদক—অর্ণব সাহা, বিশ্বজিৎ বসু, দপ্তর সম্পাদক—অসিত কুমার দাস, কোষাধ্যক্ষ—কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, পত্রিকা সম্পাদক—প্রণব দত্ত, হিসাব রক্ষক—বিমলেন্দ্রনাথ মহলানবীশ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য—পরিচয় ভট্টাচার্য, সমীরণ রায়চৌধুরী, প্রীতিরঞ্জন অধিকারী, শান্তা দত্ত, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—মনোরঞ্জন চৌধুরী, দীপক সেনগুপ্ত, অলোক গুপ্ত, সোমনাথ ব্যানার্জী, নিমাইপ্রসাদ মুখার্জী।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। হরিমোহন ব্যানার্জী—কলকাতা-হাওড়া-হুগলী-দঃ ২৪ পরগনা। ২। ধনঞ্জয় বিশ্বাস—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা। ৩। কার্তিক ঘোষাল—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৪। ধনপতি মজুমদার—বর্ধমান-বীরভূম ৫। নিখিলসুন্দর চক্রবর্তী—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর। ৬। প্রফুল্ল রায়—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার ৭। অশোক দেবনাথ—মালদহ-মুর্শিদাবাদ ৮। নিতাই সামন্ত—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর

১০ম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনঃ ১০-১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ **কম্ সোমনাথ বন্দ্যোপাধায় মঞ্চ,** শরৎ সদন, হাওড়া।

উদ্বোধক ঃ জ্যোতিপ্রসাদ বসু, সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ অশোক চক্রবর্তী, সহযোগী সম্পাদক, 'সংগ্রামী হাতিয়ার' ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশেষ অতিথি ঃ আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সহ-সভাপতি—মনোরঞ্জন চৌধুরী, কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, প্রীতিরঞ্জন অধিকারী, সাধারণ সম্পাদক---অজিত কুমার দত্ত, যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়---অরিন্দম বক্সী, বিশ্বজিৎ বসু, সহ-সম্পাদকদ্বয়---অসিত কুমার দাস ও পরিচয় ভট্টাচার্য, দপ্তর সম্পাদক---চঞ্চল সমাজদার, কোষাধ্যক্ষ---অশোক দেবনাথ, পত্রিকা সম্পাদক---প্রণব দত্ত, হিসাব রক্ষক---সুমিতরঞ্জন মুখার্জী, সম্পাদকমমন্ডলীর সদস্য—শান্তা দত্ত, দিব্যসুন্দর ঘোষ, শোভন চক্রবর্তী, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—অলোক গুপ্ত, নিমাইপ্রসাদ মুখার্জী ঈর্শান আলি, তপন মণ্ডল।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। সমীর ভট্টাচার্য—কলকাতা-হাওড়া-হুগলী-দঃ ২৪ পরগণা। ২। বাসুদেব রায়—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা। ৩। কার্তিক ঘোষাল—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৪। ধনপতি মজুমদার—বর্ধমান-বীরভূম ৫। সমীরণ রায়চৌধুরী—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর। ৬। প্রফুল্ল রায়—দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার ৭। মহম্মদ আলাউদ্দিন—মালদহ-মুর্শিদাবাদ ৮। তাপসরঞ্জন মিত্র—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর

একাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ২২-২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৮, টাউনহল, মালদা

উদ্বোধক ঃ অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ জ্যোতিপ্রসাদ বসু, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশেষ অতিথি ঃ আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—ষোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, সহ-সভাপতি—মনোরঞ্জন চৌধুরী, কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, প্রীতিরঞ্জন অধিকারী, সাধারণ সম্পাদক---অজিত কুমার দত্ত, যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়---অরিন্দম বক্সী, বিশ্বজিৎ বসু, সহ-সম্পাদক—অসিত কুমার দাস ও দিব্যসুন্দর ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ—অশোক দেবনাথ, হিসাব রক্ষক—ওয়াহিদ আনোয়ার খান, দপ্তর সম্পাদক—চঞ্চল সমাজদার, পত্রিকা সম্পাদক—প্রণব দত্ত, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য—শ্রীমতী শান্তা দত্ত, তপন মন্ডল, অর্ণব সাহা, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—অলোক কুমার গুপ্ত, ঈর্শাদ আলি, পরিচয় ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর গাঙ্গুলী।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। সুনীত ব্যানার্জী—কলকাতা-দার্জিলিং-কোচবিহার। ২। সৌমেন ঘোষ—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর। ৩। সুদীপ্ত ভট্টাচার্য—মালদা-মুর্শিদাবাদ ৪। সঞ্চিত ব্যানার্জী—বর্ধমান-বীরভূম ৫। কার্তিক ঘোষাল---বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৬। প্রভাস বিশ্বাস---নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা ৭। বাসুদেব রায়—কলকাতা-হুগলী-হাওড়া-দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ৮। অসিত সামন্ত—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর।

দ্বাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১৩-১৫ই মার্চ, ২০১০, রবীন্দ্রভবন, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা।

উদ্বোধক ঃ সমীর ভট্টাচার্য, যুগ্ম আহ্বায়ক, ১২ই জুলাই কমিটি এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রধান অতিথি ঃ প্রবীর মুখার্জী, সহকারী সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

বিশিষ্ট অতিথি ঃ আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—মনোরঞ্জন চৌধুরী, সহ-সভাপতি—কৃষ্ণকান্তি মুখার্জী, অজিত কুমার দত্ত, অসিত কুমার দাস, সাধারণ সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, যুগ্ম-সম্পাদক—বিশ্বজিৎ বসু, প্রণব দত্ত, সহ-সম্পাদক—দিব্যসুন্দর ঘোষ, চঞ্চল সমাজদার, কোষাধ্যক্ষ—অশোক দেবনাথ, হিসাবরক্ষক—তপন মন্ডল, দপ্তরসম্পাদক—দীপঙ্কর গাঙ্গুলী, পত্রিকা সম্পাদক—অলোক গুপ্ত, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য—ওয়াহিদ আনোয়ার খান, আশিস গুপ্ত,

সোমা গাঙ্গুলী, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—যোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, প্রীতিরঞ্জন অধিকারী, ঈর্শাদ আলি, জরিতা দাস, আবদুল্লা জামাল।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। স্বপন পাত্র—জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং-কোচবিহার ২। সৌমেন ঘোষ—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৩। সুব্রত চক্রবর্তী—মালদা-মুর্শিদাবাদ ৪। সঞ্জিত ব্যানার্জী—বর্ধমান-বীরভূম ৫। কার্তিক ঘোষাল—বাঁকুড়া, পুরুলিয়া। ৬। প্রভাত বিশ্বাস—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা ৭। সৌমেন চট্টোপাধ্যায়—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা ৮। বাসুদেব রায়—হাওড়া-হুগলী ৯। অভিজিৎ ভূঁইঞা—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর।

ত্রয়োদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ২৪-২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০১২, মৌলালী যুব কেন্দ্র, কলিকাতা।

উদ্বোধক ঃ ডঃ প্রভাত দত্ত, শতবার্ষিকী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—অজিত দত্ত, সহ-সভাপতি—অশোক দেবনাথ, দীপঙ্কর গাঙ্গুলী, জরিতা দাস, সাধারণ সম্পাদক—অরিন্দম বক্সী, যুগ্ম-সম্পাদক—বিশ্বজিৎ বসু, প্রণব দত্ত, সহ-সম্পাদক—দিব্যসুন্দর ঘোষ, শুভাশীষ মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ—মহঃ কালামউদ্দিন, হিসাব রক্ষক—আশিস গুপ্ত, পত্রিকা সম্পাদক—চঞ্চল সমাজদার, দপ্তর সম্পাদক—কৃশানু দেব, সদস্য—সোমা গাঙ্গুলী, দীপঙ্কর মন্ডল, অম্লান দে, স্থায়ী আমন্ত্রিত—যোড়শীপ্রসাদ মিশ্র, মনোরঞ্জন চেধুরী, দেবদাস ভট্টাচার্য, শিলাদিত্য ভট্টাচার্য, পুষ্পেন্দু সাহা।

আঞ্চলিক সাংগঠনিক সম্পাদক

১। অয়ন চ্যাটার্জী—জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং-কোচবিহার ২। মদন মন্ডল—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিন দিনাজপুর ৩। বিশ্বজিৎ মাইতি—মালদা-মুর্শিদাবাদ ৪। দেবব্রত সাউ—বর্ধমান-বীরভূম ৫। অসিত দাস—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৬। রবীন্দ্রনাথ জানা—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর ৭। বাসুদেব রায়—হাওড়া-হুগলী ৮। সমীরণ রায়চৌধুরী—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা। ৯। অসীম সাহা—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

চর্তুদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১৫-১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৪, জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম হল, জলপাইগুড়ি।

উদ্বোধক ঃ **ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী,** অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সভাপতি—শ্রী প্রণব দত্ত, সহ সভাপতি—শ্রী অসিত দাস, শ্রীমতী জরিতা দাস, শ্রী সমর তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক—শ্রী চঞ্চল সমাজদার যুগ্ম সম্পাদক—শ্রী দিব্যসুন্দর ঘোষ, শ্রী শুভাশীষ মজুমদার, সহ সম্পাদক—শ্রী আশিস কুমার গুপ্ত, শ্রী কৌশিক ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ—শ্রী গৌতম সাঁতরা, হিসাব রক্ষক—শ্রী অম্লান দে, দপ্তর সম্পাদক—শ্রী বিশ্বজিত মাইতি, পত্রিকা সম্পাদক—শ্রী কৃশানু দেব, সদস্য—শ্রী অরিন্দম বক্সী, আব্দুল্লা জামাল, শ্রী সুদীপ সরকার, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—শ্রী মনোরঞ্জন চৌধুরী, শ্রী অজিত দত্ত, শ্রীমতী সোমা গাঙ্গুলী, শ্রী রূপবিলাস মন্ডল, শ্রী শুভাশীষ চক্রবর্তী।

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

১। শ্রী নীলোৎপল চক্রবর্তী—জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং-কোচবিহার ২। শ্রী মদন মন্ডল—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৩। শ্রী সঞ্জয় মুখার্জী—মালদা-মুর্শিদাবাদ। ৪। শ্রী সুশান্ত কুণ্ডু—বর্ধমান-বীরভূম ৫। শ্রী প্রিয়ব্রত রাঢ়ী—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৬। শ্রী পুষ্পেন্দু সাহা—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর ৭। শ্রী বাসুদেব রায়—হাওড়া-হুগলী ৮। শ্রী নিরঞ্জন গায়েন—নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগনা ৯। শ্রী শিলাদিত্য ভট্টাচার্য্য—কলকাতা -দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

পঞ্চদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১৬-১৭ই জানুয়ারী, ২০১৬, মৌলালি যুবকেন্দ্র, কলকাতা।

উদ্বোধক ঃ **অধ্যাপক সুবিমল সেন।**

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

সভাপতি—প্রণব দত্ত, **সহ-সভাপতি**—অসিত কুমার দাস, কৌশিক ভট্টাচার্য, সোমা গাঙ্গুলী, **সাধারণ সম্পাদক**—চঞ্চল সমাজদার, **যুগ্ম-সম্পাদক**—দিব্যসুন্দর ঘোষ, শুভাশিস মজুমদার, **সহ-সম্পাদক**—আশিস গুপ্ত, সুদীপ সরকার, **দপ্তর-সম্পাদক**---বিশ্বজিৎ মাইতি, **পত্রিকা-সম্পাদক**---অম্লান দে, **কোষাধ্যক্ষ**—গৌতমকুমার সাঁতরা, **হিসাবরক্ষক**—শৈবাল মিত্র, **সদস্য**—অরিন্দম বক্সী, আব্দুল্লা জামাল, সুশান্ত কুণ্ডু, কৃশানু দেব, পুষ্পেন্দু সাহা, শুভ্রাংশু বসু; **স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য**—মনোরঞ্জন চৌধুরী, অজিত দত্ত, বাসুদেব রায়, শিলাদিত্য ভট্টাচার্য, প্রণবেশ পুরকাইত, শান্তনু গাঙ্গুলী।

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

১। শ্রী নীলোৎপল চক্রবর্তী—কোচবিহার-দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার ২। রাহুল ব্রহ্ম—উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর ৩। শুভাশিস চক্রবর্তী—মালদা-মুর্শিদাবাদ ৪। সুমন ঘোষ—পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর ৫। কৌশিক সামন্ত—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া ৬। দেবব্রত সাউ—বীরভূম-বর্ধমান ৭। রজত চক্রবর্তী—হুগলী-হাওড়া ৮। বাসুদেব সরকার—উত্তর ২৪ পরগণা-নদীয়া ৯। নিরঞ্জন গায়েন—কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

ষোড়শ রাজ্য সম্মেলন ঃ ২০-২১শে জানুয়ারি ২০১৮, মৌলালি যুবকেন্দ্র, কলকাতা।

উদ্বোধক: **নন্দিনী মুখার্জী**, অধ্যাপিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

ষোড়শ রাজ্য সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও অন্যান্য সদস্য

কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি---প্রণব দত্ত, সহ-সভাপতি---সোমা গাঙ্গুলি গৌতম সাঁতরা, শৈবাল মিত্র, সাধারণ সম্পাদক—চঞ্চল সমাজদার, যুগ্ম-সম্পাদক—দিব্যসুন্দর ঘোষ, বিশ্বজিৎ মাইতি, সহ-সম্পাদক—আশিস গুপ্ত, শান্তনু গাঙ্গুলী, দপ্তর সম্পাদক—কৃশাণু দেব, পত্রিকা সম্পাদক—অম্লান দে, কোষাধ্যক্ষ— আবদুল্লা জামাল, হিসাবরক্ষক—অদিতি সর্বজ্ঞ, সদস্য—অরিন্দম বকসী, শুভাশীষ মজুমদার, গৌতম সর্দার, সুশান্ত কুণ্ডু, শুভ্রাংশু বসু, প্রণবেশ পুরকাইত, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য—অজিত দত্ত, অসিত দাস, বাসুদেব রায়, অনিমেষ ঘোষ, সুদীপ সরকার, মহঃ সইদ হাসান সিমন।

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

১। দার্জিলিং-কালিম্পং-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার—নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, ২। উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর—সুভাষ মোহান্ত, ৩। মালদা-মুর্শিদাবাদ—অসীম কুমার দাস, ৪। পূর্ব মেদিনীপুর-পশ্চিম মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম—**শঙ্কর** নস্কর, ৫। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া—সুদীপ সোরেন, ৬। বীরভূম-বর্ধমান—কৌশিক পাত্র, ৭। হুগলী-হাওড়া—সুদেষ্ণা রায়, ৮। উত্তর ২৪ পরগণা-নদীয়া—শিবপ্রসাদ দাস, ৯। কলিকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা—নিরঞ্জন গায়েন।

সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ১১-১২ই জানুয়ারি, ২০২০, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, শিলিগুড়ি।

উদ্বোধক ঃ **রজত বন্দ্যোপাধ্যায়,** প্রাক্তন রেজিস্ট্রার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দিব্যসুন্দর ঘোষ, **সহ-সভাপতি**—গৌতমকুমার সাঁতরা, সোমা গাঙ্গুলী, দেবব্রত ঘোষ, **সাধারণ সম্পাদক**—চঞ্চল সমাজদার, **যুগ্ম-সম্পাদক**—আশিসকুমার গুপ্ত ও কৃশানু দেব, **সহকারী সম্পাদক**—শান্তনু গাঙ্গুলী ও শুভ্রাংশু বসু, **কোষাধ্যক্ষ**—আব্দুল্লা জামাল, **দপ্তর-সম্পাদক**—সুশান্ত কুণ্ডু, **হিসাবরক্ষক**—রিম্পা সাহা, **পত্রিকা-সম্পাদক**—অম্লান দে, **সদস্যবৃন্দ**—অরিন্দম বক্সী, প্রণব দত্ত, বিশ্বজিৎ মাইতি, অনিমেষ ঘোষ, মহঃ সঈদ হাসান, গৌতম সর্দার, **স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য**—বাসুদেব রায়, সুদীপ সরকার, প্রণবেশ পুরকাইত, সৌগত বিশ্বাস, দেবাংশু সরকার, শিবপ্রসাদ দাস।

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

দার্জিলিং-কালিম্পং-জলপাইগুড়ি-আলিদুপদুয়ার-কোচবিহার—নৃপেন্দ্রনাথ সরকার; মালদা ও মুর্শিদাবাদ—শুভব্রত মিত্র, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম—কৌশিক পাত্র, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া—তারক হালদার, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম—কৌশিক সামন্ত, হাওড়া ও হুগলী—বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা—শুভ্রান্ত ঘটক, কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা—কৃশানু সেন।

অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ৭-৮ই মে, ২০২২, নিমাইপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মঞ্চ, মৌলালি যুবকেন্দ্র, কলকাতা।

উদ্বোধকঃ **সব্যসাচী চক্রবর্তী**, বিশিষ্ট শিল্পী; বিশেষ অতিথিঃ **ড. অরুণাভ মিশ্র**, অধ্যাপক ও লেখক।

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দিব্যসুন্দর ঘোষ, **সহ-সভাপতি**—সুশান্ত কুণ্ডু, সোমা গাঙ্গুলী, দেবব্রত ঘোষ, **সাধারণ সম্পাদক**—কৃশানু দেব, **যুগ্ম-সম্পাদক**—শান্তনু গাঙ্গুলী, সুদীপ সরকার, **সহ-সম্পাদক**—মহঃ সঈদ হাসান সিমন, রিম্পা সাহা, **কোষাধ্যক্ষ**—আবদুল্লা জামাল, **দপ্তর সম্পাদক**—অনিমেষ ঘোষ, **পত্রিকা সম্পাদক**—অম্লান দে, **হিসাবরক্ষক**—ঋদ্ধি চক্রবর্তী, **সদস্য**—চঞ্চল সমাজদার, আশিসকুমার গুপ্ত, বিশ্বজিৎ মাইতি, শুভ্রাংশু বসু, দেবাংশু সরকার, তারিকুল ইসলাম, সৌগত বিশ্বাস, শিবপ্রসাদ দাস, **স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য**—প্রণবেশ পুরকাইত, গৌতম সর্দার, প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

দার্জিলিং-কালিম্পং-জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার—**শ্যাম কুমার দেওয়ান**, উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর—**মনোতোষ অধিকারী**, মালদা-মুর্শিদাবাদ—**স্বরূপ দত্ত**, বীরভূম-পশ্চিম বর্ধমান-পূর্ব বর্ধমান—**শ্রীকান্ত দে**, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া—**তারক হালদার,** ঝাড়গ্রাম-পশ্চিম মেদিনীপুর-পূর্ব মেদিনীপুর—**কৌশিক সামন্ত,** হাওড়া-হুগলী—**বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী,** নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা—**শুভ্রান্ত ঘটক,** কোলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা—**দেবপ্রসাদ মুখার্জী**।

ঊনবিংশ তিতম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন ঃ ৮-৯ই নভেম্বর, ২০২৪, **অলক গুপ্ত—বিশ্বজিৎ মাইতি মঞ্চ** ('রবীন্দ্রতীর্থ', নিউটাউন, কলকাতা)

উদ্বোধক—**পরান বন্দ্যোপাধ্যায়**, বিশিষ্ট শিল্পী

প্রধান অতিথি—**রানা মিত্র,** সম্পাদক, সারা ভারত 'নাবার্ড' কর্মচারী সমিতি

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পদাধিকারী ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি—দিব্যসুন্দর ঘোষ, **সহ সভাপতিত্রয়**—অর্ণব চৌধুরী, জরিতা দাস, দেবব্রত ঘোষ, **সাধারণ সম্পাদক**—কৃশানু দেব, **যুগ্ম সম্পাদকত্রয়**—শান্তনু গাঙ্গুলী, সুদীপ সরকার, রিম্পা সাহা, **সহ সম্পাদকত্রয়**—সঈদ হাসানসিমন, ঋদ্ধি চক্রবর্তী, সুরজিৎ মণ্ডল, **কোষাধ্যক্ষ**—আব্দুল্লাহ জামাল, **দপ্তর সম্পাদক**— সৌগত বিশ্বাস, **মুখপত্র সম্পাদক**—অম্লান দে, **হিসাব রক্ষক**—অপ্রতিম চন্দ, **সদস্য**—চঞ্চল সমাজদার, আশিস কুমার গুপ্ত, শুভ্রাংশু বসু, অনিমেষ ঘোষ, প্রণবেশ পুরকাইত, তনয়া দত্ত, **স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য**—শুভ্রান্ত ঘটক, দেবাংশু সরকার, অরিন্দম বক্সী, প্রণব দত্ত।

জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দ

দার্জিলিং-কালিম্পং-জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার—**শ্যাম কুমার দেওয়ান,** উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর— **মনোতোষ অধিকারী,** মালদা-মুর্শিদাবাদ—**মহঃ ওদুদ আলি,** বীরভূম-পশ্চিম বর্ধমান-পূর্ব বর্ধমান—**বিভাস দাস**, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া—**দেবাশীষ শেঠ,** ঝাড়গ্রাম-পশ্চিম মেদিনীপুর-পূর্ব মেদিনীপুর—**শ্রবন্ত কুমার দত্ত,** হাওড়া-হুগলি—**দেবাশীষ মুখার্জি,** নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা—**জয়তী ব্যানার্জী,** কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা—**সুপ্রভাত দাস**

১৯তম রাজ্য সম্মেলন

১৯তম রাজ্য সম্মেলন

AI, তুমি এলে তাই ...

কৃশানু দেব

চিত্র ১:- ''রাতের শহরে টহল বিশাল সিংহীর, স্রেফ শুঁকে ছেড়ে দিল ঘুমন্ত আশ্রয়হীনকে!''
চিত্র ২:- ''এআই দিয়ে নগ্ন ছবি বানিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা দাবি, ভয় এবং আশঙ্কায় নিজেকে শেষ করে দিল কিশোর!''
চিত্র ৩:- ''নিখুঁত' জাল আধার, প্যান কার্ড তৈরি করছে এআই ও চ্যাটজিপিটি! বাড়বে সাইবার অপরাধের ঝুঁকি?''
চিত্র ৪:- ''এআই নির্ভরতা বাড়িয়ে একলপ্তে ৭০০ কর্মী ছাঁটাই! 'ঠেকে শিখে' আবার কর্মী নিয়োগ করছে সুইডিশ সংস্থা-''
চিত্র ৫:- ''৪০ শতাংশ কাজ খেয়ে নেবে এআই! চাকরির সঙ্কট বাড়বে বলে উদ্বেগ প্রকাশ আইএমএফ প্রধানের''
চিত্র ৬:- ''ত্রাতা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা! কুম্ভে হারিয়ে যাওয়া ২০ হাজার মানুষকে ঘরে ফেরাল প্রযুক্তি''
চিত্র ৭:- ''ভোটের প্রচারে প্রযুক্তির অপব্যবহার রুখতে সক্রিয় কমিশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নির্দেশিকা-''
চিত্র ৮:- ''চ্যাটজিপিটির গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়াই কাল হল? এ আই বিশেষজ্ঞ সুচিরের মৃত্যুতে ঘনাচ্ছে রহস্য''
চিত্র ৯:- ''হাজারের বেশি দুরারোগ্য ও বিরল রোগ চিহ্নিত করবে এআই! নতুন মডেল আবিষ্কারের দাবি গবেষকদের''
চিত্র ১০:- ''১৫ সেকেন্ডে হৃদরোগ শনাক্ত করতে পারে এআই স্টেথোস্কোপ''

এগুলো কিছু হেডলাইন। বিভিন্ন সময়ে খবরের কাগজে এই রকমের হেডলাইন আমাদের চোখে পড়েছে। আশা-আশঙ্কা, সত্যি, নির্ভেজাল মিথ্যে, আধখানা সত্যি সবকিছুই মজুত। আট থেকে আশী সবাই বুঁদ। আমাদের সামনে নতুন নতুন চমক। দ্রুত বদলাচ্ছে সময় আর তার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে আমাদের দেশ দুনিয়া। জাঁকিয়ে বসছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স (সংক্ষেপে, AI)। খোলনলচে বদলে যাচ্ছে অর্থনীতির আঙ্গিক, কাজের ধরণের—আমাদের আটপৌরে যাপনে আজ voice assistance আমাদের ডাকে সাড়া দেয়, ভিডিও ও মিউজিক প্ল্যাটফর্মের কন্টেন্ট সাজেস্ট করে, রোগের নির্ণয় থেকে নিরাময়ে সাহায্য করে, জালিয়াতি ধরে, পণ্য পরিবহনে ধকল কমায় এবং পণ্য উৎপাদনে মান যাচাই করে, মায় গানের সুরও দেয়, আরও আরও অনেক কিছু। পাক্কা কল্পতরু। হইচই চারদিকে। নভেম্বর, ২০২২ । OpenAI এর ChatGPT মোটামুটি একটা নতুন ফ্রন্ট খুলে দিয়েছে আর generative AI আজ প্রায় ঘর-গেরস্থালির শব্দ! কিন্তু, আর একটু ভালোভাবে পরিচয় করাটাও দরকার।

একটু গোড়া থেকেই শুরু করা যাক, তাহলে। প্রশ্ন হল, 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলতে আমরা কী বুঝব? এ পরিসরে খুব সহজ করে বলতে গেলে বলা যায় যে, যে সব কাজ, কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে সম্পন্ন করা যায় যেমন ধরা যাক, দুটো বড় সংখ্যাকে গুণ বা ভাগ করা, বা কোনও সংস্থার টাকাপয়সার হিসাব রাখা—সেই কাজ করতে ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধি লাগে না। যে কোনও কম্পিউটারকে সেই কাজগুলো শেখানো যায় অর্থাৎ, programming করা যায়। কিন্তু, এমন কিছু কাজ আছে যা আমরা অনায়াসেই করতে পারি; অথচ কেউ যদি হঠাৎ দুম করে জিজ্ঞাসা করেন যে, কী ভাবে করলাম? তাহলেই হয়েছে আর কি! চট করে বলতে পারা যাবে না। যেমন ধরা যাক একই ধরণের অনেকগুলো ছাতার মধ্যে নিজের হারানো ছাতাকে চেনা এই রকম কিছু বা ধরা যাক কারোর হাতের লেখা চিনতে পারা ইত্যাদি। একটা যন্ত্রকে সেই কাজগুলো আয়ত্ত করানোর প্রযুক্তির নামই

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)।

আমরা জানি যে মানুষ যখন বুঝতে পেরেছে যে 'আর একটু ভালোভাবে বাঁচার তাগিদে' তাঁর গায়েগতরে কুলোচ্ছে না, তখন সে যন্ত্রের কথা ভেবেছে। হাতের প্রয়োজনে হাতিয়ার—শিকারে কাজে লেগেছে লাঠিসোঁটা-বল্লম, সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে পালতোলা নৌকো, মালবহনে ব্যবহার হয়েছে চাকা। উদ্বৃত্ত সম্পদের দখলের যুদ্ধে সে-ই জিতেছে, যার অস্ত্রশস্ত্র তির-ধনুক, গোলা-বারুদ, বন্দুক-কামান ছিল বিপক্ষের তুলনায় উন্নত। পরবর্তীতে শিল্প বিপ্লব। তার মধ্যে দিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অনেকটাই স্বয়ংক্রিয় করা সম্ভব হয়েছিল। শুরুর দিকে ভারী শিল্পে শক্তিশালী বড় মেশিনগুলোর সাহায্যে যে কাজগুলো পরিশ্রমের সেগুলোই স্বয়ংক্রিয়ভাবে করানোর চেষ্টা করা হয়। এই কাজগুলো করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম বা নির্দেশ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে জুড়ে দিয়ে মানুষের কায়িক শ্রম অনেকটাই কমিয়ে পণ্য উৎপাদনকে বাড়ানো সম্ভব হয়।

উনিশ শতকের গোড়ায় চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) যে computing device/ calculator তৈরি করেন, তার প্রয়োজন নাটকীয়ভাবে দেখা দিয়েছিল ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ব্রিটেন তার প্রয়োজনীয় সব পণ্যের জন্যই আমেরিকার উপর নির্ভরশীল আর জার্মান ইউ-বোট এই পণ্যবাহী জাহাজের হদিস করে ডুবিয়ে দিচ্ছিল অথচ জার্মান নৌবাহিনীর সঙ্কেতবার্তায় ব্রিটেন আড়ি পাততে পারছে না। কারণ, জার্মানরা তাদের সাঙ্কেতিক ভাষা রোজ বদলে দিচ্ছে। ব্রিটেন তার গণিতজ্ঞদের একটা বিশেষ দলকে (cryptogrpher) দায়িত্ব দেয় decode/ decipher করার জন্য। এই দলের নেতা ছিলেন অ্যালান টিউরিং (Alan Turing)। এই টিউরিংকেই মনে করা হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জনক। কোন্ মেশিনকে বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী বলা হবে, তিনি তার একটা সংজ্ঞাও ঠিক করে দেন। তিনি imitation game বা অনুকরণের খেলা নামে একটি টেস্ট আবিষ্কার করেন যাকে টিউরিং টেস্ট বলে। যা মূলত যন্ত্রের ওপর একজন মানুষের সমতুল বা মানুষ থেকে স্বতন্ত্র বুদ্ধিমত্তাগত আচরণ করার দক্ষতা প্রমাণের একটা পরীক্ষা, যেখানে যন্ত্রের পক্ষ থেকে দেওয়া উত্তর একজন মানুষের উত্তরের কতটা কাছাকাছি হয় শুধুমাত্র সেটা পরীক্ষা করা হবে, কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার সক্ষমতা যাচাই করা পরীক্ষাটির উদ্দেশ্য নয় । আজকাল আমরা যে ধরণের চ্যাটবটের সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত—customer care service, help desk ইত্যাদি অনেকটা সেই রকম। ৭০-৮০ বছর আগে যিনি চ্যাটবটের কথা ভেবেছিলেন, অবশ্যই তাঁর দূরদর্শিতার তারিফ করতে হয়।

Digital Computer তৈরির পর প্রথম দুটো দশকে তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানের জন্যই। হালে বিশ শতকের শেষে, AI ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের আওতার মধ্যে আসে। একুশ শতকের গোড়া থেকে মেশিনের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে বহু কাজ করা সম্ভব হয় যেগুলো আগে কখনো চিন্তাই করা যায় নি। আগে যেসব কাজে মানুষের বুদ্ধি, মেধা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হত সেখানে এসেছে ইন্টেলিজেন্স সম্বলিত নতুন প্রযুক্তি।

আজ তো Tesla-র গাড়ি ড্রাইভার ছাড়া দিব্যি চলছে। Benz এর গাড়িও নাকি এখন সব দিক দেখে নিজেই ওভারটেক করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। AI guided missile বেশ কিছুদিন ধরেই যুদ্ধের অঙ্গ। এখন তো কোথায়, কখন মিসাইল ছুঁড়তে হবে সেটাও নাকি AI ঠিক করে দিচ্ছে। Artificial Satellite হোক আর ballistic missile, ছোঁড়া থেকে ফেলার কাজেও AI ব্যবস্থায় precision rate খুবই ভালো। কোন্ কোম্পানির শেয়ার কেনা উচিত, কোন্ শেয়ার এবেলা বিক্রি করে দেওয়া উচিত; আমাদের এই জ্ঞান এত কাল দিয়ে এসেছেন দালাল স্ট্রিটের বাঘা বাঘা 'এক্সপার্ট'রা, আজ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী AI system। এমনকি হালে তো ChatGPT বিবেচিত হচ্ছে Payment Gateway হিসাবেও। হার্ট থেকে হাঁটু অপারেশন, AI guided রোবট হাত পাকিয়েছে micro surgery এর

মতো সূক্ষ্ম কাজেও। 'Alexa' বা 'Google Gemini', বা হালের 'Perplexity' - এর মতো চ্যাটবট এখন আমাদের মুঠোতে। আজকে Chatbot ব্যবহারে বড় সুবিধা যে, তার সঙ্গে আমরা নিজের ভাষায় কথা বলি। কী দিন এল!

প্রশ্ন হ'ল প্রথাগত বা traditional software আর AI এর মধ্যে তফাৎটা কোথায়? Traditional software কাজ করে কিছু fixed, pre-defined rules, instruction এর ওপর ভিত্তি করে। শেখার বা অভিযোজিত হওয়ার কোনো inherent ability নেই, নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিতভাবে software update করতে হয়। তথ্য বা data এখানে গৌণ, logic condition-টাই মুখ্য। Output দেওয়ার ক্ষেত্রেও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রত্যাশিত—একই input দিয়ে বারবার একই রকম ফল পাওয়া যায়। কোনো নির্দিষ্ট, well defined problem এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়মে standard বা প্রামাণ্য ফল দেয়। ভুল ত্রুটি, bug খোঁজার ক্ষেত্রে programme এর code এর মধ্যে তা চিহ্নিত করা হয়। অন্য দিকে, AI-Driven System কাজ করে মুখ্যতঃ data থেকে indicative pattern তৈরি করার মধ্য দিয়ে most probable response করায়, যা কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে হয় না। এই ব্যবস্থা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন data incorporation এর মধ্যে দিয়ে output কে refine করতে থাকে এবং সেটা একটা continuous process হয়। ফলতঃ data এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যত বেশি, যত সঠিক, যত বৈচিত্র্যপূর্ণ data আসবে তত output এর যথাযথ হওয়ার সম্ভাব্যতা বাড়বে। ফলে এখানে output সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে পারে। Spam চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বা জটিল, dynamic সমস্যা যেখানে নির্দিষ্ট নিয়ম কার্যকর হওয়া সম্ভব নয় সেখানে AI ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে কার্যকর। তবে AI প্রযুক্তির limitation হ'ল পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্যের ঘাটতি। আর এখানেই ঘনিয়েছে সিঁদুরে মেঘ। এই তথ্য সংগ্রহ এবং তার ব্যবহার কী খুব ethical ভাবে করা হচ্ছে? এসব ক্ষেত্রে Copy Right Act, Intellectual Property Rights Act মানা হচ্ছে কী? যে বিপুল তথ্য ভাণ্ডার (data cloud) ইন্টারনেটে জমা হচ্ছে তার সুরক্ষার guarantee কে দেবে? আপনার কোন্ তথ্য কখন darkweb এ বেচাকেনা হবে তার আগাম সতর্কতা কোথায়? একটা সময় এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকরা এই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার স্বচ্ছতার, দুর্নীতিমুক্ততার পক্ষে জোর গলায় সওয়াল করেছিলেন, আর এখন? পিঠ দেখাচ্ছেন, বলছেন 'নিজের মাল, নিজে সামলান'! আগে তবু চোরকে দেখার বা চেনার একটা সম্ভাবনা ছিল, এখন তো তাও নেই। এ যেন 'টকের জ্বালায় ঘর ছাড়লাম, তেঁতুলতলায় বাস'!

প্রযুক্তির এই চলার পথ অনিবার্য । সেটা ঠিকই। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে Multi National Corporation, World Bank, IMF ইত্যাদি বিশ্বজনীন সংস্থার মাধ্যমে যে global capitalism এর বিস্তার, তা আদতে information technology/ internet এর ওপর নির্ভরশীল যা আমাদেরকে AI-guided data oriented অর্থনীতির দিকে নিয়ে গেছে, যেখানে algorithm, machine learning এবং accumulated data-র transaction এর মাধ্যমে profit করা হয় যা আজকে Data capitalism হিসাবে চিহ্নিত। আলফাবেট/গুগল, মেটা/ফেসবুক, মাইক্রোসফট, অ্যাপল এর মতো বড় বড় tech giant সংস্থারা AI ব্যবহার করে অনলাইন কন্টেন্ট এবং ব্যবহারকারীর চাহিদা/পছন্দ (interest) কে package হিসাবে বিক্রি করে ফুলেফেঁপে উঠছে।

এটা তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, Capitalist দের চাহিদা এবং পছন্দের ওপর ভিত্তি করেই প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে। তারাই মুখ্যত সেই নতুন প্রযুক্তির সব সুবিধা নেয় আর বাকি সবাইকে এর চড়া দাম মেটাতে হয়; এবং সেটা দীর্ঘমেয়াদী। আখের গোছানো ছাড়া আর কোনো নীতি নৈতিকতা নেই এই crony capitalists দের। এই data capitalist/ platform capitalist-রা তাদের আখের গুছোনোর জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের

behavioural data এর ওপর সবার অলক্ষ্যে নজরদারি চালায় যাকে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের প্রফেসর সুজানা যুঁবফ (Susana Zuboff), 'Surveillance Capitalism' বা 'নজরদারির ধনতন্ত্র' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলছেন যে যেকোনো ইন্টারনেট ভিত্তিক ডিজিটাল পরিষেবার ব্যবহারকারীদের আচরণগত যে data তা আদতে বিনামূল্যে পাওয়া কাঁচামাল বা raw material যার কিছুটা ব্যবহার হয় পরিষেবাকে উন্নত করার কাজে আর বাদবাকি data আসলে উদ্বৃত্ত বা surplus কাঁচামাল যা মেশিন ইন্টেলিজেন্স বা মেশিনের বুদ্ধিমত্তা নামক উন্নত উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত (data processing) হয় এমন এক পণ্যে (comodity) যা অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে prediction করতে পারে ব্যবহারকারীর আচরণ, পছন্দ/অপছন্দ- অর্থাৎ আপনি কোথায় বেড়াতে যেতে পারেন, কি খাবার খেতে পারেন, কি ধরনের জামা কাপড় কিনতে পারেন, এমনকি কোন্ কোম্পানীর শেয়ার কিনতে পারেন ইত্যাদি। আদতে আপনি যে পরিষেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিনামূল্যে পাচ্ছেন, সেখানে আপনি আর পরিষেবার খরিদ্দার নন। আপনি আসলে কাঁচামালের সরবরাহকারী। এইভাবে নজরদারির ধনতন্ত্রে মালিকপক্ষ procured and processed data কে মুনাফার জন্য বিক্রি করছে অন্য কোন কোম্পানির কাছে। এই প্রযুক্তির দৌলতে আমাদের বাড়ি আর 'বাড়ি' নেই, বরং তা একটা production hub যেখান থেকে প্রতিমুহূর্তে তৈরি হচ্ছে, সংগৃহীত হচ্ছে রসদ—বাজারে বিক্রী হওয়ার জন্য। আমাদের মুঠোফোনে ভরা বিভিন্ন App আমাদের জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে এই কাজ করে চলেছে। Pegasus software এর কথা মনে আছে? এই data derivation এর জন্য কোনো সম্মতি আমরা দিই না, অন্ততঃ জ্ঞানতঃ নয়। বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করার সময়ে যদিও আজকাল অনেক কোম্পানি বা সংস্থা কুকিজ (cookies) ব্যবহারের জন্য অনুমতি চায়। তবে সবক্ষেত্রেই যে অনুমতি চাওয়া হয় এমনটাও নয়, আর তাছাড়া এই বিষয়ে এবং কোম্পানিগুলির আরোপিত শর্তাবলীর বিষয়ে ভালোমতো জানা বোঝা না থাকায় আমরা অনেক সময় অজান্তেই সম্মতি দিয়ে থাকি।

তবে শুধুমাত্র এই তথ্য কোনো আগ্রহী কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে মুনাফা বাড়ানোই নয়, নজরদারির পুঁজিবাদে তথ্যের মালিক এই তথ্যের সাহায্যে নাগরিকদের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে মধ্যস্থতা করার, তাঁদের পছন্দ/অপছন্দকে control করার সুযোগও হাতে পেয়ে যাচ্ছে। মানব সভ্যতার শুরুর আগেও পৃথিবীতে মানুষ ছিল। তারা দলবদ্ধ অন্যান্য প্রাণীর মতোই চলাফেরা, আচার আচরণ সবকিছুই একসাথে করত। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষ যেমন বাসা তৈরি করেছে, প্রকৃতি থেকে উৎপাদনের প্রকরণ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে শিখেছে, বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে শিখেছে, তেমনি তার আচরণে এসেছে স্বকীয়তা। প্রত্যেক মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মানুষকে অন্য প্রাণীর থেকে যেমন আলাদা করে তুলেছে তেমনই মানুষের আচার আচরণেও বৈচিত্র্য এসেছে। এই নজরদারির ধনতন্ত্রে মালিকপক্ষ তাদের সুবিধার্থে আমাদের স্বকীয়তা ঘুচিয়ে আচরণ, মনোভাব, অভ্যাস, প্রবণতা সবক্ষেত্রেই অভিন্ন ধাঁচা আনতে চাইছে। যেভাবে আমরা এই টার্গেটেড বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য, তাকে সুজানা আখ্যা দিচ্ছেন "instrumentarianism" বা যন্ত্রবাদ বলে। এই যন্ত্রবাদ একজন ব্যক্তির স্বকীয়তার বদলে তাঁর জীবনধারণে, তাঁর আচরণে, এমনকি তাঁর মানসিকতাতেও পরিবর্তন নিয়ে আসতে চাইছে।

তবে, শুধু বাণিজ্যিক স্বার্থ নয়, এই data থেকে আহরিত তথ্য সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারে কোন রাষ্ট্র শাসকও, বিশেষ করে সেই রাষ্ট্র যখন তার নাগরিকদের নজরদারীর আওতায় রাখতে চায়। সুতরাং সেই দিক থেকে বলতে গেলে দেশের সরকারও এই AI দিয়ে তৈরি পণ্যের ক্রেতা বা গ্রহীতা। রাষ্ট্র পরিচালন শক্তি বা সরকার সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে এই তথ্যের অধিকার চেয়ে থাকে। তবে সবসময় নিরাপত্তা নয়, রাষ্ট্রে ক্ষমতা কায়েম রাখার স্বার্থে জনমতকে অনুকূলে রাখতে এই তথ্য ব্যবহার করা হয়। আর কোম্পানিগুলিও এই তথ্য তাদের হাতে তুলে

দেয় যাতে রাষ্ট্রনীতি তৈরি এবং পরিচালিত হয় তাদের কায়েমীস্বার্থে। আমেরিকা হোক বা অন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সরকার নির্বাচনে এই পুঁজিপতিদের ভূমিকা আজ দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট।

এইখানে রয়েছে আরও একটা আশঙ্কা—Deep fake। এই deep fake প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ডিপফেক একধরনের আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি যার দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে ইমেজ, অডিও বা ভিডিও তৈরি করা যায়। যেমন ধরা যাক একজন লোকের কৃত্রিম ছবি তৈরি করা যায় এমনভাবে যে তিনি কোন একটি পরিস্থিতিতে ছিলেন না, অথচ তাঁকে সেই জায়গাতেই রয়েছেন দেখানো যেতে পারে। যেখানে কে. এল. সায়গলের গলায় বাবা সায়গলের Rap music বা উল্টোটাও সম্ভব! আপনার ভয়েস দিয়ে এমন কথা বলানো যেতে পারে যা বাস্তবে আপনি হয়তো আদৌ বলেন নি! একই ভাবে কোন ঘটনা যা বাস্তবে ঘটে নি তার ভিডিও তৈরি করা যায়। কোন একজনের মুখ বিভিন্ন দিক থেকে কেমন দেখতে লাগে সেই বিষয়ে যদি কম্পিউটারকে প্রশিক্ষিত করে তোলা যায়, তাহলে কম্পিউটারের দ্বারা সেই লোকের নকল ছবি, অডিও বা ভিডিও তৈরি করা সম্ভব। হালে ডিপফেক প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে generative adversarial networks (GAN)। এই পদ্ধতিতে কম্পিউটারে দুটো অ্যালগরিদমকে পরিপূরক হিসেবে কাজে লাগানো হয় যেখানে একটা ফেক বা নকল ছবি, অডিও / ভিডিও তৈরি করে এবং অন্যটা ওই নকল ছবি, অডিও / ভিডিও কতটা বাস্তবসম্মত হয়েছে সেটা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দেয়। এই তৈরি করা এবং প্রতিক্রিয়া দেওয়া এই কাজ পুনরাবৃত্তির ফলে উত্তরোত্তর কৃত্রিম ছবি, অডিও বা ভিডিও উন্নততর হয়ে ওঠে, অর্থাৎ বাস্তবতার অনেক কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং তা নকল বলে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যায়। Deep fake প্রযুক্তি Copy right, Intellectual property right এর ক্ষেত্রেও ভয়ঙ্কর সংকটের বার্তা নিয়ে এসেছে। আজ শুধু Hollywood এ নয়, আমাদের মুলুকেও রয়েছে অশনি সঙ্কেত। কোনো শিল্পীর নকল ভিডিও তৈরি social media content তৈরি করা হচ্ছে দেদারভাবে। ডিপফেক প্রযুক্তির দ্বারা পুরনো গান, সিনেমা থেকে কিছু অংশ ব্যবহার করে নতুন কোনো গান বা সিনেমা তৈরি করা সম্ভব। অনুমতি ছাড়া এই সমস্ত কিছুর ব্যবহার বেআইনি। অথচ ডিপফেক প্রযুক্তি যাঁরা ব্যবহার করছেন, তাঁরা অনেক সময়েই এই আইন লঙ্ঘন করছেন। এতে মানুষের creativity এর বিকাশে অবমূল্যায়ন ঘটছে। সৃজনশীল কাজের মানে আপোষ হচ্ছে। কবিতা বা ছবি বা গানের সুর AI এর হাত ধরে যদি ফরমায়েশি পায় তাহলে পরিস্থিতিটা ভাবুন একবার। সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আপনি হয়তো আপনার AI নির্ভর একটা সিস্টেমকে বলতে পারেন 'বিস্কুট' নিয়ে শঙ্খ ঘোষের 'ধাঁচে' একটা কবিতা লিখে দিতে বা সলিল চৌধুরীর মতো গান লিখে সুর দিতে ! আরও মারাত্মক হল যেটা আপনার audio-visual clippings ব্যবহার করে আপনার স্বার্থবিরোধী, সম্মানহানিকর কাজ। এই ধরনের অপব্যবহার আজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেও করা হচ্ছে। কোনো ব্যক্তির মুখ অন্য ব্যক্তির শরীরের সঙ্গে যুক্ত করে প্রথম ব্যক্তি কোনো অসঙ্গত ব্যবহার করছেন বা অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তা দেখানো যেতে পারে। AI ব্যবহারের ফলে কোনটা সত্যি আর কোনটা ডিপফেক দিয়ে তৈরি তা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে!

এখানে আরও একটা সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে যেটা মহামারির রূপ নিতে পারে। সেটা হল ইনফোডেমিক (Infodemic)। এই বিপদটা হল জেনারেটিভ আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (GAI)-এর বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করার সময়ে ইন্টারনেটে লভ্য তথ্যের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরতা। ইন্টারনেট তার নিজস্ব চরিত্র অনুযায়ী কোনো সংস্থা বা কোনো ব্যক্তিবর্গ বা কোনো সরকারের অধীনে নয়, অন্ততঃ, এখনও পর্যন্ত তার sovereignty আছে। ইন্টারনেট যে খুশি ব্যবহার করতে পারে এবং তার নিজস্ব blog, website, Facebook a/c, Instagram,

YouTube, X ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের লেখা, মতামত, ছবি, কবিতা, নাচ, গান ইত্যাদি অনেক কিছুই আপলোড করতে পারে। এই কারণেই ইন্টারনেটের এতটা প্রসার সম্ভব হয়েছে। Internet এর এই চরিত্র যাতে বজায় থাকে এবং ইন্টারনেট কোন সরকার বা বাণিজ্যিক বা অন্য ধরনের সংস্থার করায়ত্ত না হয় সেটা আমরা প্রত্যেকেই চাই। কিন্তু ইন্টারনেটে যদি কেউ ভুল তথ্য আপলোড করেন তবে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সেটা বিশ্লেষণ করে বাদ দেওয়া বা পরিহার করে চলার মতো ব্যবস্থা এখনও চালু নেই। Google এর wikipedia হোক আর Musk এর Grokipedia তদের information এর authenticity কোথায়? ফলে কোনো ভুল তথ্য যদি ইন্টারনেটের কোন ওয়েবসাইটে থেকে যায় বা কোন পরিষেবা প্রদানকারী প্রযুক্তির কাছে পৌঁছে যায় তাহলে চ্যাটজিপিটির মত AI system কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বা কোন রিপোর্ট বা নিবন্ধ তৈরি করার সময় সেই ভুল তথ্যই ব্যবহার করবে। সুতরাং এই ধরনের ভুল তথ্য ইন্টারনেট থেকে তৈরি লেখা বা ছবিতে যে চলে আসছে শুধু তাই নয়, ডিপ লার্নিং-এর উন্নত অ্যালগরিদমের প্রয়োগে এই ধরনের ভুল তথ্য অতি দ্রুত গতিতে ছড়িয়েও পড়ছে। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও এতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এই ধরনের ভুল তথ্য ভাইরাসের মতো দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়াকেই Infodemic বলে। WHO আবার infodemic বলতে কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে সেই রোগ সম্পর্কিত ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়াকে বোঝায়। যেহেতু ইন্টারনেটে সবসময়েই অজস্র তথ্য আপলোড হচ্ছে, সেই সমস্ত তথ্যের মধ্যে থেকে ভুল তথ্য খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার সামিল। এই রকম কিছু ভার্চুয়াল 'ইউনিভার্সিটিতে' অনেক সময় এমন সব তত্ত্ব আওড়ানো হয় যা দেখলে বা শুনলে পিলে চমকে যায়! বিপদ হলো যে একটা বড় সংখ্যক মানুষ তাতে বিশ্বাসও করেন। থালা বাজিয়ে, আলো নিভিয়ে কোভিড ভাইরাস তাড়ানোর মতো 'জ্ঞান-তত্ত্ব' আওড়ানোর ঘটনার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি মানুষের বিজ্ঞান মনস্কতাকে সবসময় বাড়ায় না। লাগাতার জনসচেতনতা ছাড়া শুধুমাত্র আইন তৈরি করে এর থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়।

গত বছর দশেক ধরে আমরা দেখছি AI কে কাজে লাগিয়ে একদিকে দুনিয়াজুড়ে Internet cloud platform এ ব্যাপক আগ্রাসনমূলক ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা এবং অন্যদিকে বিকেন্দ্রীভূত, অনিশ্চিত কাজের ধরন। এর সাথে তাল মিলিয়ে কাজের সাধারণ চরিত্র বদলে যাচ্ছে—অস্থায়ী কাজ, কাজের সময় বৃদ্ধি, কম মজুরি, শ্রম আইনের অনুপস্থিতি এবং পুঁজির বেলাগাম দখলদারি। এক কথায় আজকের গিগ অর্থনীতি। এই গিগ অর্থনীতি হল এমন একটি শ্রম ব্যবস্থা যেখানে কর্মী/শ্রমিকরা স্বল্পমেয়াদী, চাহিদা-ভিত্তিক 'গিগ' বা কাজের জন্য স্বাধীনভাবে চুক্তিবদ্ধ। মালিকরা তাদের এই গিগ অর্থনীতির সাফল্য গাইতে গিয়ে সাফাই দেয় যে, গিগ অর্থনীতি শ্রমিকদের জন্য যেমন খুশি তেমন কাজ, যেমন খুশি তেমন মজুরির সুযোগ এনে দিয়েছে, যেন 'সব পেয়েছির আসর'। এই মালিকদের মতে, নতুন প্রজন্মের শ্রমজীবীরা চায় 'স্বাধীনতা', এই 'স্বাধীন মজুর'রাই গিগ অর্থনীতির চালিকা শক্তি, 'micro entrepreneur' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব গালভরা মিথ্যের আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে কীভাবে এই নয়া ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ তার আসল লক্ষ্য গোপন করছে। এই 'মুক্ত মজুর'রা আসলে পুঁজিবাদের বল্গাহীন শোষণের শিকার। এই ধরনের কাজে কিছুটা flexibility থাকলেও traditional job এর মতো কোনও নির্দিষ্ট বেতন, সামাজিক সুরক্ষা যেমন—provident fund, pension, insurance কিচ্ছু নেই। উবের এর একজন চালককে রাইড পিছু ৫০ শতাংশ কমিশন দেওয়ার অর্থ হল বাকি ৫০ শতাংশের কোনও মজুরিই সে পায় না। কেউ যদি দিনে ১২ ঘন্টা গাড়ি চালায়, কমিশন বাবদ তার মোট শ্রম-সময়ের অর্ধেক সে পায়, তাই দিয়েই তাকে জ্বালানি ভরতে হয়, গাড়ি সারাতে হয়, এসির গ্যাস ভরতে হয়, পরিবারের যাবতীয় খরচ মেটাতে হয়। প্রত্যেকটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তার পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীর (intermediary) কাজ করছে। অ্যামাজন / ফ্লিপকার্ট মাঠে গম চাষ করে

না, কারখানায় ময়দা তৈরি করে না, রান্নাঘরে মোগলাই পরোটা বানায় না বা প্রেসে বই ছাপায় না, শুধুমাত্র মোগলাই পরোটা বা বই বা ময়দা গ্রাহকের কাছে পৌঁছনোর জন্য একজন মজুর নিয়োগ করে দালালির কাজ করে। পুঁজিবাদ সব সময়েই শ্রমিক কর্মচারীকে বাড়তি খাটিয়ে অতিরিক্ত লাভ করে, গিগের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশের চিরাচরিত খুচরো ব্যবসার বাজার যেখানে এক বিশাল সংখ্যক মানুষের রুটি-রুজির সংস্থান হয়, তা ভেঙে পড়তে চলেছে।

এই গিগ মজদুরদের মতো piece wage বা খণ্ড মজুরির কাজেও শ্রমিকরা বাধ্য হয় বাড়তি পরিশ্রম করতে যাতে বাড়তি রোজগার করা যায়। টানা হয়তো ২০ ঘণ্টা উবের এর গাড়ি চালানো, বা সকাল থেকে সন্ধ্যা টানা ডেলিভারি করে যাওয়া। মজুরি দেওয়ার আগে সারাক্ষণ নজরদারিতে রাখা হয়—কে কতক্ষন গাড়ি চালাচ্ছে, কে ক'টা ডেলিভারী দিল, ডেলিভারি দিতে কত দেরি হল এই সব। গাড়ির টায়ার পাংচারের জন্য সারাইও করতে হবে শ্রমিককে, আবার দেরির জন্য তারই মজুরিতেও কোপ বসে! জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আরও আরও তাড়াতাড়ি ডেলিভারি দিতে ছুটে চলা 'রাণার'-এর মতো 'আরো জোরে, আরো জোরে ...'। 'কোনও স্থায়ী কাজ নেই' , এই বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে এই পিস ওয়েজ মজুররা বাধ্য হচ্ছেন গিগ অর্থনীতির শরিক হতে, তাঁরা চকচকে entrepreneur নন, বরং তার ঠিক উল্টো দিকে শ্রমিকশ্রেণির সবচেয়ে অনিশ্চিত অংশ যার একমাত্র সম্বল; শ্রম। শ্রমিক ও প্রযুক্তির মধ্যেকার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে আভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চূড়ান্ত আকার নিচ্ছে। স্বল্প মেয়াদে কাজের বাজার থেকে কেউ ছিটকে যাচ্ছেন সঙ্কটকালে খরচ কমানোর অজুহাতের ছাঁটাইতে, আবার কেউ ছিটকে যাচ্ছেন দীর্ঘমেয়াদে অটোমেশনের সঙ্গে দৌড়ে হেরে গিয়ে। স্বনির্ভরতার নামে চরম অনিশ্চয়তা। পুঁজিবাদের অনিবার্যতায় উৎপাদক আর গ্রাহকদের মধ্যে পরজীবী মুনাফাখোর দালাল যেমন অ্যামাজন, ইনস্টামার্ট, ওলা, উবের, তেমনই আবার উবের আর গাড়ি চালকের মধ্যেও জন্ম নিচ্ছে আর এক শ্রেণীর দালাল, যারা উবের অ্যাপে চালানোর গাড়ি বা বাইক ভাড়ার বিনিময়ে ধার দেয়! এরা পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মাঝে প্যারাসাইটের মতো থাকে, ফলতঃ একদিকে যেমন পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ে, তেমনই অন্যদিকে শ্রমিকের শোষণ আরও বাড়ে।

ভারুফাকিসের (Yanis Varufakis) মতো অর্থনীতিবিদরা এই পুঁজিকে বলছেন Cloud capital আর এই নতুন ব্যবস্থাকে বলছেন Technofeudalism। সেখানে তাঁদের মতে 'ক্লাউডালিস্টরা' তাদের প্ল্যাটফর্মভিত্তিক জমিদারী এবং ডেটা-অস্ত্রের মাধ্যমে প্রতিপত্তি লাভ করে। বিশেষ করে ইন্টারনেট বেসরকারিকরণ এবং ২০০৮-পরবর্তী আর্থিক নীতির সমন্বয়ের কারণে। তাঁদের মতে Land enclosure যেমন পুঁজিবাদের উন্মেষে সহায়তা করেছিল, তেমনই digital enclosure এই নব্য cloud capitalism কে আরও তীব্র করছে। বস্তুতঃ Data-powered 'ক্লাউড পুঁজিপতিরা' তাদের পুঁজিবাদী ক্ষমতাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত করেছে। ক্লাউড প্রোলস (proles), অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় শোষিত শ্রমিক, এবং cloud serf যারা মূল্যবান data process করছেন, তাঁরা সবাই ক্লাউড ক্যাপিটালের শোষণের শিকার। এই তত্ত্বের সমালোচকরা বলছেন যে এটা একটা নতুন ধাঁচের অর্থনৈতিক পরিবর্তন (metamorphosis) ঠিকই কিন্তু কোনো serfdom নয়, পুঁজিবাদ বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। উপভোক্তা-ব্যবহারকারীরা যেমন ভূমিদাস (serf) নন তেমনই উৎপাদক-ব্যবহারকারীরাও ভূমিদাস (serf) নন। Internet ব্যবস্থার বেসরকারীকরণের ফলে cloud platform এর একচেটিয়া দখলদারীর ক্ষেত্রে নতুন কোনো জমিদারী ব্যবস্থা (feudalism) তৈরি হচ্ছে নাকি যা হচ্ছে সেটা capitalism, তার form নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে তবে Capitalist হোক আর cloudalist তারা কেবল তখনই তৎপর হয় যখন তারা আরও বেশি লাভ বা অন্তত ভবিষ্যতের লাভের ধারণা আন্দাজ করে। Serfdom বলি আর Capitalist দের Cartel, তাতে শ্রমিক-কর্মচারীর

ওপর নেমে আসা আক্রমণের মাত্রার তীব্রতার content এ কিছু হেরফের হয় না।

আজকে এই অর্থনীতিতে মূলত তিনটে বৈশিষ্ট্য আমরা মোটামুটি দেখতে পাই , (১) গিগ অর্থনীতিতে শ্রমিক স্থায়ী কাজের বদলে কেবলমাত্র কতগুলো খণ্ড কাজ (পিস ওয়ার্ক)-এর ভিত্তিতে খণ্ড মজুরি (পিস ওয়েজ) পান, (২) ডিজিটাল মাধ্যমে ক্রেতা-উপভোক্তারা বিপুল পণ্য ও পরিষেবা কেনার সুযোগ পান এবং (৩) ডিজিটাল পদ্ধতিতে মধ্যস্বত্বভোগী সংস্থা, কার্যত যারা ব্রোকার, উৎপাদক ও উপভোক্তার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।

প্রশ্ন হল, মূল উৎপাদনক্ষেত্র বা Core Manufacturing Sector এ AI এর প্রভাব কি রকম? এটা লক্ষ্যনীয় যে AI ও তার অনুসারী অন্যান্য প্রযুক্তিগত উন্নতির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সত্ত্বেও, হালের বছরগুলোতে অনেক উন্নত অর্থনীতিতেও উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম। বিশেষতঃ USA তে তো বটেই। ২০০৮ এর মহামন্দা যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তা USA এর বাইরে শুধু OECD ভুক্ত দেশ নয় এবং আরও সম্প্রতি অনেক বড়ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশেও জাঁকিয়ে বসেছে। AI ব্যবহারের ethical limit, data encription এর কার্যকারিতা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে বিভিন্ন দেশে। এই digital content এর ব্যবসায়িক মূল্য যেমন সবসময় GDP তে প্রতিফলিত হয় না তেমনই per capita আয়েও তা ঠিকঠাকভাবে আসে না। আমরা আবারও যেন সোলোর প্যারাডক্স (Solow Productivity Paradox, 1987)-এর মুখোমুখি হয়েছি বলে মনে হচ্ছে, যেখানে বলা হয়েছিল যে—We see computers everywhere except in the productivity statistics। AI-এর ক্ষেত্রেও বোধহয় একই কথা খেটে যায়- AI সর্বত্র দৃশ্যমান হলেও উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিতে এখনও পর্যন্ত কোনও দৃশ্যমান উন্নতি দেখা যাচ্ছে না।

এখানে একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল যে, AI এবং Automation Technology এর ব্যবহারের বাড়বাড়ন্তের ফলে মানুষের শ্রমশক্তি বা কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগানোর মোট সময়কাল কমছে। অর্থাৎ আগে যে পরিমাণ কাজ মানুষকে দিয়ে করানো হত, এখন তার অনেকটাই যন্ত্রের দ্বারা করানো সম্ভব হওয়ার ফলে বেশ কিছুটা সময় উদ্বৃত্ত হচ্ছে। এই উদ্বৃত্ত সময়ের যদি সমবন্টন হত, তাহলে কর্মসংকোচন তো ঘটতই না, বরং শ্রমিক বা কর্মীরা তাদের উদ্বৃত্ত সময় অন্য কোনো সৃজনশীল কাজে বা বিনোদনে পরিবার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারতো। কিন্তু, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা কী বলে? বরং, এখন দেখা যাচ্ছে যে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষকে কাজে না লাগিয়ে স্বল্পসংখ্যক মানুষকে দিয়ে অতিরিক্ত সময় ধরে কাজ করানোর প্রবণতা বাড়ছে। কিছুদিন আগে আমাদের দেশের দুটো দিকপাল আই টি কোম্পানির দুই কর্মকর্তার একজন আই টি সেক্টরে কর্মরত কর্মীদের সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন আরেকজন প্রত্যেক ছুটির দিনে পরিবারকে সময় দেওয়ার বিরোধিতা করে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। আট ঘণ্টা কাজের অধিকারের দাবিতে শ্রমিকশ্রেণির দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস আছে তাকে নস্যাৎ করা হচ্ছে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে প্রযুক্তির প্রয়োগের দ্বারা উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের সমবন্টন হলে এই দৈনিক আট ঘণ্টা সময় কমে দিনে ছয় ঘণ্টা বা সপ্তাহে চার বা পাঁচ দিন কাজে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু, আজকের পৃথিবীতে কিছু মানুষকে প্রতিদিন অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা বা কখনো তারও বেশি। আর অন্যদিকে ক্রমশ বেড়ে চলেছে কর্মহীন বা কর্মচ্যুত মানুষের সংখ্যা যা সামাজিক ভারসাম্যকে বিনষ্ট করছে। যা আজ দেশ রাষ্ট্রের সীমানা গণ্ডি মানছে না।

এখানেই দেখার যে এই AI কিভাবে ব্যবহার করা হবে—মানুষের শ্রমের পরিপূরক হিসাবে না কি মানুষের শ্রমের প্রতিস্থাপক হিসাবে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ও রোবোটিক্স-এর অটোমেশনের যে নেতিবাচক প্রভাব তা' আমরা দেখেছি সেখানে পৃথিবী জুড়ে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হ্রাস এবং আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি প্রকট। যদি AI, এই

অটোমেশনকে আরও বাড়িয়ে তোলে, তবে তার পরিণতি কী হবে তা বুঝতে রকেট সায়েন্স পড়তে হবে না। AI-এর দ্রুত অগ্রগতি যে অনেক পেশাকে বিলুপ্ত করার হুমকি দিচ্ছে, সেটা কেবল লেখক ও অভিনেতাদেরই কাজের ক্ষেত্র নয়, নিয়মিত কাজের অংশ আছে এমন চাকরি, যেমন কেরানির কাজ এবং যেসব কাজে সাধারণ তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের সারসংক্ষেপ তৈরি ও লেখার কাজ সেগুলো সব আস্তে আস্তে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে এই পরিসরে। বিশেষত কম দক্ষ বা পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ করা এমন কর্মীদের জন্য এটা একটা সাংঘাতিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে—মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে বৈষম্য যেমন আরও বাড়ছে তেমনই পেশাদার শ্রেণীর যারা এই প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ, মেধাজীবি কর্মচারী তাঁদের সঙ্গেও অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে। এটা শুধু আর অফিস কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, কারখানার শ্রমিক থেকে শুরু করে ইলেক্ট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, শিক্ষক এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা কেউ বাদ থাকছেন না।

কম্পিউটারের ব্যাপক প্রয়োগ হলে বহু মানুষ কাজ হারাবে, এ কথা বলে একসময়ে বামপন্থীরা আমাদের অনেকের কাছেই বিরাগভাজন হয়েছিলেন। AI এর প্রয়োগ যে হারে বাড়ছে, তাতে নিশ্চিত বলা যায় যে কিছু নতুন কাজ তৈরি হলেও, অনেক বেশি মানুষ কাজ হারাচ্ছেন। এবার শুধু কল-কারখানার শ্রমিক মজদুরের (prols) ছেলেমেয়ে নয়, আমার-আপনার ছেলেমেয়েরাও চাপে রয়েছে। ডাক্তারবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে উকিলবাবুর মোক্তার, আকাউন্ট্যান্ট থেকে tax consultant; এঁরা সবাই দেখছেন অল্পবিস্তর কাজ চলে যাচ্ছে কৃত্রিম মেধাপ্রাপ্ত চ্যাটবটের অফিসে। এমনকি আমাদের সরকারী পরিষেবাও এর আওতার বাইরে নয়। অদূর ভবিষ্যতে quantum technology এই digital মাধ্যমের কাজের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। প্রশ্ন হল এসব কিছু কাদের হাত ধরে হবে? ক্ষমতালিপ্সু একনায়ক, নয়া ফ্যাসিবাদী oligarchy নাকি বিকল্প কোনো ব্যবস্থার। পুঁজির মালিক তথা শাসকশ্রেণির oligarchi এর আসল উদ্দেশ্য হল দেশের উৎপাদক, শ্রমিক-কর্মচারীশ্রেণিকে অস্থায়ী খণ্ড মজুরির শ্রমিক বাহিনীতে পরিণত করা, সংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীশ্রেণিকে আরো বিচ্ছিন্ন করা, তাঁদের দর কষাকষির যাবতীয় অধিকার কেড়ে নিয়ে সর্বত্র অস্থায়ী ও চুক্তি নিয়োগকে ব্যাপক রূপ দেওয়া। 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট' অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নিয়োগের উদ্দেশ্যে শ্রম আইনে বদল আনা হচ্ছে এমনকি বদল আনা হচ্ছে এইসব শ্রমিক-কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা ক্ষেত্রেও যেখানে এমন কোনও বিধি নেই যা গিগ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা, Pension বা ESI এর সুবিধা দিতে পারে। সামাজিক সুরক্ষার গালভরা প্রতিশ্রুতি আসলে একটি প্রতারণা যার আড়ালে লুকিয়ে আছে শ্রম সম্পর্ক, নিয়োগ সম্পর্কে আরও অস্থায়ী, অনিশ্চিত চেহারা দেওয়ার অ্যাজেন্ডা। গিগ মজুরদের ন্যূনতম মজুরি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিষয়ে দেশের নীতি আয়োগ সম্পূর্ণ নীরব! AI ব্যবস্থাকে সামনে রেখে গিগ মজদুরদের নিয়ে নীতি আয়োগের চালাকিকে বেআব্রু করে, নীতির আড়ালে থাকা দুর্নীতির রাজনীতিকে মানুষের সামনে আনা প্রয়োজন। নীতি নির্ধারকরা দেশে এই গিগ অর্থনীতিকে 'ফর্মালাইজ' করতে চায় অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে পিস ওয়েজ কাজের মডেল চালু করতে চায়—স্থায়ী কাজ কেড়ে অস্থায়ী ভঙ্গুর অনিশ্চিত কাজের জমানাকে বৈধতা দেওয়ারই পদক্ষেপ।

প্রশ্ন হল, আজকে এই ক্লাউড বাজারও কী প্রতিযোগিতার জন্য open field? প্রতিযোগিতার মাঠ কি আরও leveled হচ্ছে? এই প্রতিযোগিতার regulator কারা? মাস্কের Twitter বা জুকারবার্গ এর WhatsApp কেনার তীব্র প্রতিযোগিতা অথবা Starlink এর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার তাগিদেতে আমাদের দেশের দুই বড় ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়া কোম্পানীর ঝাঁপিয়ে পড়া কোন্ আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার ইঙ্গিত করে? Cartel তৈরি করে ভার্চুয়াল তথ্য সাম্রাজ্যের দখলদারির? অদূর ভবিষ্যতে এই রেষারেষি পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে মহাকাশে পৌঁছে যাবে।

পেশাগত ক্ষেত্র ছাড়াও আজকে আমাদের ব্যক্তিগত পরিসরে এবং সামাজিক পরিসরে যোগাযোগের, মত প্রকাশের মাধ্যমগুলোও কি নিয়ন্ত্রণমুক্ত (free & liberal)? আমাদের ভাবের আদান প্রদান, বাক স্বাধীনতা কি নিয়ন্ত্রিত? কে বা কারা নিয়ন্ত্রণ করছে? এই প্রশ্নগুলো এই পরিসরে ভীষণভাবে জীবন্ত। এইখানেই আসছে Digital Surveillance এর বিষয়। রাষ্ট্রের দমনশক্তি AI কে এই কাজে লাগাচ্ছে। Deep fake কে কাজে লাগিয়ে নিরন্তর মিথ্যা তথ্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য, ছবি, ভিডিও ব্যবহার করে জনমতকে polarise করার narrative তৈরি করা হচ্ছে। যা সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক।

এই প্রযুক্তির একচেটিয়া দখলদারি যত পুঁজির মালিক ও তাদের অনুগত কয়েকজন প্রযুক্তিবিদের কুক্ষিগত থাকবে, তত পৃথিবী জুড়ে কর্মচ্যুতি, বেতনের বৈষম্য এবং সর্বোপরি সামাজিক বৈষম্য আরও ব্যাপকভাবে বাড়বে। অন্যদিকে এই প্রযুক্তির ব্যবহার যদি সামগ্রিকভাবে মানুষের হিতে হয় তাহলে অবশ্যই প্রত্যেক মানুষের কাছেই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল পৌঁছবে। আগামীদিনে প্রযুক্তির ব্যবহারের এই দিক পরিবর্তন ঘটানোটাই মানবসভ্যতার কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। আর যদি এভাবেই চলতে থাকে তবে একথা অবশ্যই বলা যায় যে আগামীদিনে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর চেহারাটা পালটে যাবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আরও ঘনীভূত হবে পুঁজিপতি আর তাদের সহায়ক অতি সামান্য কিছু মানুষের হাতে, যারা বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মেশিনগুলোকে চালাবে। বাদবাকি মানুষ টিকে থাকবে এদেরই দাক্ষিণ্যে। এই চূড়ান্ত অসাম্যের বিপরীতে যে সমাজব্যবস্থা সকলের ন্যায্য অধিকারের কথা বলে, একমাত্র সেই সমাজেই প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার হতে পারে। অন্যভাবে বললে একমাত্র সেই সমাজেই প্রযুক্তি মানবজাতিকে সার্বিক উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে পারে।

বিভিন্ন দেশে তথ্য-প্রযুক্তির উপভোক্তার গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত আইনি রক্ষাকবচগুলো এখনও খুবই দুর্বল। বা ত্রুটিপূর্ণ। AI এর ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারা তথ্য প্রযুক্তির কোম্পানি গুলো যেভাবে উপভোক্তার behavioral data ব্যবহার করে তা এক অর্থে গণতন্ত্রবিরোধী এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল। সভ্যতার বিকাশের স্বার্থেই প্রযুক্তির ব্যবহার বাঞ্ছনীয়, তার অবদমনের জন্য নিশ্চয় নয়। তাই এই বিষয়ে প্রযুক্তিবিদ থেকে সাধারণ মানুষ প্রত্যেকের সচেতনতা, সহযোগিতা এবং প্রতিরোধ জরুরী। এই লড়াইটা কঠিনতম লড়াই কারণ পুঁজিবাদী বিশ্বে এই প্রতিপক্ষ শুধুমাত্র অনেক বেশি ক্ষমতাশালীই নয়, তাকে প্রত্যক্ষও করা যায় না, নিরাকার। আজকের এই multi polar দুনিয়ায় কোনো একক রাষ্ট্রশক্তির তুলনায় এই global finance capital অনেক বেশি শক্তিশালী এবং সে চায় পৃথিবীর geo politics এ সবসময় একটা crisis বজায় রাখতে, একটা perpetual state of war, একটা tension যা তাদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখবে। ফলতঃ দেশের সীমানা ছাড়ানো এই ধান্দার পুঁজিবাদ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সন্ত্রাসবাদ, বিভাজনের রাজনীতি, যুদ্ধের রাজনীতিতে উস্কানি দেয়, দালালি করে । এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের, দেশের মধ্যে জাতিগত, ধর্মগত, গোষ্ঠী—সম্প্রদায়গত বিভাজন বাড়ায়, বিদ্বেষ ছড়ায়। একমাত্র উদ্দেশ্য হল তাদের লাভের রাস্তা সুনিশ্চিত রাখা। যুদ্ধ, দাঙ্গা, হানাহানিতে কোনোদিন আপামর শান্তিপ্রিয়, নিরীহ, সাধারণ মানুষের ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। এ প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয়ও সামনে চলে আসছে যে সারা পৃথিবীতে এই মন্দাজনিত অনিশ্চিত কাজের বাজার, অর্ধসত্য, বিনির্মিত সত্য, নির্জলা মিথ্যা তথ্যের স্রোত মানুষের মনোজগৎ থেকে যুক্তিবাদকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে (Destruction of Reason; George Lukacs) আর তার যায়গা নিচ্ছে উগ্র দক্ষিণপন্থার irrationality। এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে (ছদ্ম বিরোধিতা নয়) হলে সচেতন নাগরিক সংহতিই একমাত্র হাতিয়ার।

তাই মানবিকতার স্বার্থে উন্নত চিন্তার বিকাশ ঘটানো ও তার প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন পথের সন্ধান করাই এই

মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। আমাদের লক্ষ্য হল প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার, সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানব-হন্তারক হিসাবে নয়। এই বোধ তখনই সার্বিকভাবে সমুন্নত হবে যখন আমাদের বিজ্ঞানসঞ্জাত সংবেদনশীল সমাজবোধ জাগ্রত হবে। ফলে এই লক্ষ্যে আমাদের অবিচল থাকার লড়াই চলবে এবং আগামীদিনে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান না-করে, প্রযুক্তির নব-প্রকরণ তা সে AI technology হোক আর nano technology, তার সুফল পাওয়া যাবে না। শ্রমিক কর্মচারী সহ আপামর সাধারণ মানুষের স্বার্থানুকূল আর্থ সামাজিক ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার প্রবহমান লড়াইয়ের থেকেই সমাধানের খোঁজ করতে হবে সবাইকে।

"এখন আতঙ্ক দেখি পৃথিবীর অস্থিতে মজ্জায়,
সভ্যতা কাঁপিছে লজ্জায়;
স্বার্থের প্রাচীরতলে মানুষের সমাধি রচনা,
অযথা বিভেদ সৃষ্টি, হীন প্ররোচনা
পরস্পর বিদ্বেষ সংঘাতে,
মিথ্যা ছলনাতে;
আজিকার মানুষের জয়;
প্রসন্ন জীবন মাঝে বিসর্পিল, বিভীষিকাময়"—
সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)

তথ্যসূত্র:

১. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Powe - Susana Zuboff (২০১৯);
২. Techno feudalism- What Killed Capitalism - Yanis Varoufakis (২০২৩) এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবায় বেসরকারিকরণের প্রভাব

অম্লান দে

জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ভারতীয় সংবিধান অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত, সংবিধানের চতুর্থভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশাত্মক নীতি সেই জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি। এই নীতিগুলি রাষ্ট্রকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের মোটামুটি একটি সংজ্ঞা এইভাবে দাঁড় করানো যেতে পারে যে—জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হল একটি ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে দায়িত্ব পালন করে। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের অভীষ্ট লক্ষ্য হল—নাগরিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করা, সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করা ও সমাজের দুর্বল অংশগুলির জন্য সামাজিক সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলা। সংজ্ঞা থেকেই জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়—

১) মৌলিক চাহিদাপূরণ— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক চাহিদাগুলির পূরণ।

২) সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান।

৩) সামাজিক ন্যায়বিচার

৪) নাগরিকদের সার্বিক উন্নয়ন—

চারটি মূল বৈশিষ্ট্যর সাথে একান্তভাবে সম্পৃক্ত থাকে দুটি বিষয়—স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নৈতিক দায় থাক নাগরিককে এই দুই পরিসেবা প্রদান করা। এখানে ক্রেতা-বিক্রেতা বা লাভজনক-অলাভজনক শব্দ দুটি ধ্রুপদীভাবে আসা উচিত নয়। আপনাকে নিয়ন্ত্রণের জায়গায় কেউ নেই, প্রত্যেকেই ইকোসিস্টেমের কারণ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণাকে সংবিধানের পাতায় ধারণ করেনি, ডঃ বি.আর আম্বেদকরের ভাষায়—''Soul of the constitution'-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছে, যে ধারণা সমূহ নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যা রাষ্ট্রের জন্য একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে যা আদালতের মাধ্যমে বলব্যযোগ্য না হলেও রাষ্ট্রের শাসন নীতি ও আইনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

স্বাধীনতার পরবর্তীতে রাষ্ট্রের এই দায়িত্ব রাষ্ট্র সুচারুভাবে পালন করেছে তা নয়। স্বাধীনতা উত্তর ভারত বিবিধ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ফলতঃ স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ থেকে নাগরিকরা বঞ্চিত হয়েছেন এবং রাষ্ট্রও পারেনি নিজ দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্বাহ করতে। প্রত্যাশা থাকে, প্রত্যাশার ধর্ম বর্ধিত হওয়া, সেই চাহিদা বা প্রত্যাশা অন্যায় নয়। কিন্তু উদারনীতির অর্থনীতি বিশ্বের মানচিত্রকে যেদিন থেকে খামচে ধরে পৈশাচিক দাপাদাপি শুরু করেছে সেদিন থেকেই রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সাথে লাভ-ক্ষতি, বিনিয়োগ-ডিভিডেন্ড, পরিসেবা-ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক যুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় দায় কমানোর (Minimum Governance) সাথে পুঁজির ক্ষেত্র উন্মুক্ত করার রাজনৈতিক দায় রাষ্ট্রব্যবস্থাপনা নিজের দিকে টেনে নিয়েছে, নিরুপায় পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছে এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার নামকরণ করছে 'সংস্কার' রূপে। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে সাধারণভাবে ভারতের মুদ্রাস্ফীপিতির হার ৬% থেকে ৭% কিন্তু

চিকৎসা মূল্যস্ফীতির পরিমাণ ১৪-১৫%। অর্থাৎ চিকিৎসা ক্রয়ের খরচ বেড়েছে ভীষণভাবে। একটা সার্বিক ইকো-সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে, যার মধ্যে চিকিৎসা প্রদানকারী সংস্থা, চিকিৎসক, ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা, বিভিন্ন পরীক্ষার উপকরণ ও পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সবাই যুক্ত আছেন কিন্তু একক ভাবে ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রণের জায়গায় কেউ নেই, প্রত্যেকেই ইকোসিস্টেমের অংশ হিসেবে ক্রিয়াশীল; নিয়ন্ত্রক বিনিয়োগকারী আরো স্পষ্ট করে বললে বেসরকারি বিনিয়োগকারী। মানবিক এক ক্ষেত্রকে দানবিক লাভজনক ক্ষেত্রে পরিণত করার কুশীলব, 'রাষ্ট্র' সেখানে অসহায়তার বর্মে আচ্ছাদিত। অথচ উন্নয়নসূচকে চিকিৎসা, সুলভ চিকিৎসা তথা সুস্বাস্থ্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আরও বিষয় আছে—সাধারণ পণ্যের সাথে চিকিৎসা পরিসেবার একটি মৌলিক পার্থক্য আছে—সাধারণ পণ্য ক্রয়ের সময় ক্রেতা জানেন তিনি কি ক্রয় করতে যাচ্ছেন অর্থাৎ চিনি কিনতে চাওয়া ক্রেতাকে তরকারি বিক্রি করতে চাইলে তিনি নেবেন না, কিন্তু চিকিৎসা পরিসেবার ক্ষেত্রে তা নয়—এখানে রোগী জানেন না তাঁর চিকিৎসা প্রণালী কি হবে? তিনি চিহ্নিত করতে পারেন তার শরীরের উপসর্গগুলিকেই—কারণ চিহ্নিতকরণ বা নিরাময়ের পদ্ধতি তার জানার কথা নয় সেক্ষেত্রে তাঁকে ভরসা করতেই হবে চিকিৎসাপ্রদানকারী সংস্থা বা চিকিৎসকের উপর। সেক্ষেত্রে ওষুধের প্রয়োজন। অর্থাৎ নিরাময় বা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ পরীক্ষা, নিরীক্ষা বা ওষুধ প্রয়োগ অবশ্যাম্ভাবী। কিন্তু ওষুধের দাম লাগামছাড়া হয়ে চলেছে, বহুজাতিক সংস্থাকে প্রাধান্য দেওয়ার দায়বদ্ধতা গ্রহণ করেছে সরকার বা রাষ্ট্র, নানান কৌশলে বহু ওষুধকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে করে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে ওষুধের ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ করে, পেটেন্ট আইন চালু হয়, হাতি কমিটির সুপারিশে ওষুধ নীতি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, Drug Price Control Order প্রকাশ হয়েছিল সাধারণ মানুষের ওষুধের দামের সুরাহার কথা মাথায় রেখে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার অধীনে বহু ওষুধ তৈরীর সংস্থা তৈরী হয় বিভিন্ন রাজ্যে; ফলতঃ মুনাফা নয় জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শুরু হয় কম খরচে ওষুধের উৎপাদন। কিন্তু উদারনীতির থাবা পড়ার সাথে সাথে লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষা শুরু হয়ে গেল। সরকারী সংস্থা বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে রুগ্ন করে দেওয়া হল। ১৯৭৯ সালে যখন DPCO প্রকাশিত হয় তখন উপাদানের খরচ ভিত্তিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে তিনটি ভাগে ওষুধকে ভাগ করা হয়েছিল—

১। প্রয়োজনীয় ওষুধ, ২। গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ, ৩। অবশিষ্ট ওষুধ।

উদ্দেশ্য ছিল ওষুধের মূল্যমান সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখা; কিন্তু ১৯৮৭ সালের DPCO যখন প্রকাশিত হল অবশিষ্ট ওষুধের বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। বিষয়ের আঙ্কিক হিসাব হল—১নং বিভাগের ওষুধগুলির উৎপাদন খরচের উপর ৪০%, ২ নং বিভাগের ওষুধগুলির উৎপাদনর খরচের উপর ৫৫% সাথে রিটেলার মার্জিন ১৬% এবং এক্সাইজ কর ধরে MRP ঘোষিত হল—৩নং বিভাগের ওষুধের ১০০% উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। ১৯৯৫ সালের DPCO তে বিভাগ-১ এর ওষুধগুলি ১০০% উন্মুক্ত করে দেওয়া হল, ওষুধের তালিকায় থাকা ১৪০টি ওষুধকে কমিয়ে ৭৬-এ নিয়ে আসা হল। ২০১৩ সালের DPCO তে বলা হল উৎপাদক পাইকারি মূল্য সূচকের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ মূল্যবৃদ্ধি বৎসরে একবার করতে পারবে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হবে না এর সাথে আবগারি শুল্কের বাড়বাড়ন্ত যুক্ত হল। রাষ্ট্র তার সাংবিধানিক নৈতিক দায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে খুচরা মূল্যবৃদ্ধিতে মদত দিতে থাকল আর আবগারি শুল্ক আদায় কর্তে থাকলো অর্থাৎ মিথোস্ক্রিয়ার এই প্রক্রিয়ায় নাগরিক শুধু ক্রেতা, রাষ্ট্র লাভজনক অবস্থানে আর ওষুধ উৎপাদনকারী মুনাফার দাবিদার। এর সাথে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে ১২-১৮% GST, ফলতঃ ১৯৭৫ সালের হাতি কমিটির রিপোর্টানুযায়ী 'সার্বজনীন ওষুধ' এখন একটি

ঐতিহাসিক দলিল মাত্র, ২০১৩-১৪-র পর থেকে রাষ্ট্র তার সব দায় ঝেড়ে ফেলে বাজারী দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। পদপিষ্ট হচ্ছে অসুস্থ নাগরিক। এখানেই থেমে নেই রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ প্রস্তুত সংস্থা যেগুলি কোনক্রমে বেঁচে আছে তার বড় শেয়ার তুলে দেয়ো হচ্ছে বেসরকারি হাতে, পোষাকি নাম দেওয়া হয়েছে স্ট্রাটেজিক সেল। FDI এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে সংস্থাগুলি ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিল এতো বড় উন্মুক্ত বাজার তাদের আবার ফিরিয়ে আনছে। জাপানের দানচি সানকিও মার্কিন বহুজাতিক অ্যাবট ল্যাবরেটরিজের ফিরে আসা ভারতীয় ওষুধ নির্মাণ সংস্থাকে অধিগ্রহণ করা নীতির ফসল, বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একই সাথে চলছে জাল ওষুধের রমরমা, নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়েছে কর্পোরেট পুঁজিকে তুষ্ট করার জন্য; বিনিময়ে?? ইলেকটোরাল বন্ডে কে কোথায় কত ভেট চড়িয়েছিল সেই কার্য-কারণ সম্পর্ক পরিষ্কার বোঝা যাবে।

উল্টো চিত্রও ছিল; ১৯৬০-৭০ দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলি স্বাস্থ্যকে বিষেশ গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে গণ্য করা শুরু করে, ভারত ও সেই পথের অনুসারী ছিল, কিন্তু এখন তা এগিয়ে চলেছে অনিয়ন্ত্রিত বেসরকারিকরণের দিকে। এর বিপরীতে একটা ন্যারটিভ তৈরী করার চেষ্টা হচ্ছে সেটা হল উন্নত পরিসেবা। এই ন্যারাটিভের বিরুদ্ধে বলার কথা গুটি বসন্ত নির্মূলকরণ আমাদের দেশে হয়েছিল কি বাজার বা বেসরকারি উদ্যোগে? না সরকারি উদ্যোগে হয়েছিল। পোলিও নির্মূলকরণে কোনো কর্পোরেট পুঁজি অংশগ্রহণ করেছিল? সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় জনস্বাস্থ্য সযোগের মাধ্যমে হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে আলমা আটা কনফারেন্সে বিশ্বের ১৪টি নাগরিক স্বাস্থ্য সচেতন দেশের প্রতিনিধিরা আওয়াজ তুলেছিল ২০০০ সালের মধ্যে 'Health for All' সফল করা যাবে জনস্বাস্থ্য সংযোগের মাধ্যমে। হয়নি, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং উদারনৈতিক অর্থনীতির প্রবল স্রোতে জনস্বাস্থ্য সংযোগ প্রক্রিয়া দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমতে থাকে, IMF, বিশ্বব্যাঙ্ক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ''Pay at the point of service' প্রকল্পগুলিকে উৎসাহিত করতে থাকে, পুনর্গঠনের নামে ঋণ দিতে থাকে ফলতঃ দৃষ্টিভঙ্গ পাল্টাতে থাকে দ্রুত। তাই আলমা আটায় গৃহীত ''Health for all'' পরিবর্তিত হয় ''Health Care for all'. চিকিৎসা বীমাগুলিও মুনাফার আখড়াতে পরিণত হয়েছে। এমনকি সরকারি স্বাস্থ্যবীমাও সাধারণ মানুষ, গরীব পুঁজির কারবারিদের ঘরে যাচ্ছে; ফল ভুগছে সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষ। জনস্বাস্থ্য নাগরিকের অধিকার যা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য, তাই স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ কমিয়ে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করলে পরিকাঠামো দুর্বল হয়। কোভিড মহামারী চোখে আঙুল দিয়ে তাই দেখিয়ে দিয়েছে। প্রয়োজন স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে সকলের জন্য স্বাস্থ্য—এই হতে হবে যাত্রাপথ, লগ্নিপুঁজি মুনাফা বোঝে, রাষ্ট্রের দায় বহনের ইচ্ছা বা কর্তব্য তার থাকার কথা নয়, সরকারকেই সেই উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতিকার অপেক্ষা প্রতিরোধ চিকিৎসা ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর, কিন্তু প্রতিরোধ-প্রতিষেধকের নিবিড় অনুশীলন-এর অভাব প্রকট হচ্ছে, নিয়ন্ত্রণ শিথিল হচ্ছে, মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্য কোনো পণ্য নয়, তা পরিষেবা এবং রাষ্ট্রের নৈতিক দায়।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা প্রশ্ন করতে শেখায়, শিক্ষা অন্ধকার থেকে আলোতে যাওয়ার দিক নির্দেশ করে। আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস, অধিকারবোধ, শিক্ষাবিহীনভাবে হতে পারেনা। বাঙলার নবজাগরণের ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দেয়। তাই জাতি গঠনের উন্নয়নের, দায় রাষ্ট্রের, তাই শিক্ষার সম্পূর্ণ দায় রাষ্ট্রের। ২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি কি সে রাষ্ট্রীয় দায়কে সমর্থন করে? উত্তর—না। শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে উন্নত দেশীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন, কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত করা শিক্ষানীতির মৌলিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। উদার জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে বিকাশ

তার লক্ষ্য হওয়া উচিত, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence."। তাই সঙ্কীর্ণ পরিচিতিসত্তা বা বাণিজ্যীকিকরণ এবং কেন্দ্রীকরণ কোনো শিক্ষানীতির মৌলিক ভিত্তি হতে পারেনা। কিন্তু বাস্তবে নতুন শিক্ষানীতিতেও পুঁজি নিবেশ জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেই নীতির মৌলিক উদ্দেশ্য হবে—কেন্দ্রীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ, কাজের বাজারে সস্তা শ্রমিকের যোগান দেওয়াই তার উদ্দেশ্য, মজুরির দ্বন্দ্বে, অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াই-এ দর কষাকষির ক্ষমতা হ্রাস করা তার অভীপ্সা; ২০১৪ সলের পর ১লক্ষ সরকারি স্কুল এদেশে বন্ধ হয়েছে, বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে ১৪%, কি ইঙ্গিত দিচ্ছে? গণশিক্ষার কাঠামো ধ্বংস হচ্ছে। ভারতবর্ষের শিক্ষানীতির ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। ১৯৬৮ সালে কোঠারি কমিশনকে ভত্তি করে প্রথম শিক্ষানীতি প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ সালে দ্বিতীয়বার যদিও গৃহীত হয় ১৯৯২ সালে, তৃতীয়বার শুরু হয় ২০১৬ সালে আত্মপ্রকাশ করে ২০২৩, দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ধরা পড়ে। ১৯৬৮ সালে DPSP কে মাথায় রেখে যা ছিল রাষ্ট্রীয় দায় ২০২০-তে তা পরিণত হল Commodity-তে; ১৯৯১ সালে উদারনৈতিক অর্থনীতি বিস্মৃত হলে ভুল হবে। উদারনৈতিক অর্থনীতির সময়কালে শিক্ষায় বেসরকারিকণের উদ্যোগ দানবীয় বাণিজ্যিকিকরণের উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। স্বাস্থ্যের পর ভারতে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হল শিক্ষা তাই বাণিজ্যিকিকরণ করতে পারলে মুনাফার জোয়ার আসবে সেই কারণেই, তাই সমাজসেবা নয় মুনাফা মূল লক্ষ্য; আর তাতে রাষ্ট্রের সায় আছে—দায় ঝেড়ে ফেলার প্রবণতা আছে ফলতঃ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে কাজে লাগানোর বিপ্রতীপে কর্পোরেটাইজেশন চলছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। IIT, IISC-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পদ, সম্পদের সম্ভাবনার সেই খনিতে অবাধে ঢুকে পড়ার ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে বৃহৎ পুঁজির মালিকরা। সরকারি হোক বা বেসরকারি স্কুল ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে কেন? আর্থিক সঙ্গতিতে পেরে না ওঠা একটা কারণ, অসম গুণমানে ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা আপাত অসম্ভব মনে করে হতাশার বহিঃপ্রকাশ আর একটি বড় কারণ। বৃহৎ পুঁজি অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা সহকারে এ দেশের গ্রামেগঞ্জে হতদরিদ্রদের কাছে শিক্ষার আলো নিয়ে যাবে না, আলো ঝলমল প্রাচুর্যের কাছে শিক্ষাকে পণ্য সাজিয়ে বিক্রয় করবে ফলে সামাজিক অসাম্য বাড়বে দেশের মধ্যে তৈরী হবে আর এক দেশ, একটি দেশ আলো ঝলমলে অপর দেশ—অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রাথমিক শিক্ষা মৌলিক অধিকারে পরিণত হলেও বাস্তবচিত্র পর্যালোচনা করা দরকার, অসুখ খুঁজে ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন। সাক্ষরতা আজও ১০০% হয়নি এদেশে অথচ বিদেশে কর্মরত প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা বিলিয়ন ছাড়িয়েছে। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশও এগিয়ে গেছে এব্যাপারে। এই বৈষম্য দূর করার দায় রাষ্ট্রের; কর্পোরেট নয়, সরকারি বরাদ্দ বাড়িয়ে, পরিকাঠামোকে উন্নত-প্রসারিত করলে সেই প্রয়াস সফল হবে, একই সাথে সামাজিক মতামত গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন। সাধারণ পরিবার, দরিদ্র পরিবার সুস্বাস্থ্য, সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবার জন্য, সস্তার শ্রমিক হবার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি, শত ফুল প্রস্ফুটিত এমনি এমনি হবে না, তার জন্যে সংবিধান প্রদর্শিত পথে রাষ্ট্রকে বর্ধিত দায়িত্ব নিতে হবে, সার্বিক উন্নত শিক্ষা, সার্বিক জনস্বাস্থ্যর দাবি utopian দাবি নয়, তা স্বীকৃত, অর্জন করার অধিকার মানুষের আছে; বিত্ত নয়, শ্রেণী নয়, সম্প্রদায় নয় এই অধিকার এই দেশের প্রত্যেক জনগণের।

জমি, জল, জঙ্গল—কর্পোরেট লোলুপতা—একটি সমীক্ষা

দেবব্রত ঘোষ

ঘটনা-এক: (১) : আমাদের দেশের বিভিন্ন মেট্রো শহরে জিম করতে যাওয়া মাসলম্যানদের অনেকেই আজকাল ট্রেনারের কাছে জানতে চাইছে, ব্রেস্ট মিল্ক কোথায় কিভাবে কিনতে পাওয়া যায়? কী কাজে লাগবে মাতৃদুগ্ধ? এরকম একটা ধারণা সম্প্রতি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে ব্রেস্ট মিল্ক খেলে দারুন মাসল গ্রোথ হয়। কারণ এতে একটি বিশেষ ধরণের প্রোটিন আছে। কেমন চলছে এর বাজার? ভারতীয় জিমাররা হিউম্যান মিল্কের খোঁজ খবর সদ্য শুরু করলেও, এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে ''পুঁজির স্বর্গদ্বার'' ট্রাম্পের আমেরিকা। সেখানকার বেশ কয়েকটি প্রদেশে হিউম্যান মিল্কের রমরমা ব্যবসা চলছে। হ্যাঁ ব্যবসাই চলছে মাতৃদুগ্ধ নিয়ে। মূলত বডি বিল্ডার ও জিমে নিয়মিত যাওয়া তরুণদের একাংশ শক্তপোক্ত পেশি গঠনের জন জন্য মাতৃদুগ্ধ পান করছেন। যাঁরা সদ্য মা হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই অনলাইনে, নিজেদের বুকের দুধ বিক্রী করছেন আর ই-কর্মাস মার্কেট বা সরাসরি মায়েদের থেকে তা কিনছেন ''জিম ব্রো'' রা। এতোটুকু জানার পর প্রশ্ন আসতেই পারে যে এতে অসুবিধার 'কী আছে, একজন মায়ের শিশু যতোটক দুগ্ধ সারাদিনে পান করে তার অনেক বেশী পরিমান দুগ্ধ বহু মা'এর শরীরে তৈরী হয়ে হয়। অতিরিক্ত দুগ্ধ বিক্রী করে রোজগারের মধ্যে অন্যায়ের কী আছে। এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আজকের মূল নিবন্ধের সারাংশ।

বিজ্ঞানীরা কী বলছেন? বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অপূর্ব ঘোষ বলছেন, ''যে ধারণার ভিত্তিতে মাতৃদুগ্ধ খাওয়ার এই ট্রেন্ড, তার কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই। আমরা প্রকৃতিকে অস্বীকার করতে পারিনা। মায়ের বুকের দুধ তার সন্তানের জন্যই তৈরী হয়। চিকিৎসক দ্বীপেন্দ্র সরকার বলছেন, ''এই বিষয়টি অবশ্যই বন্ধ হওয়া দরকার, এমনকি এই নিয়ে কোন গবেষণাকেও উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়। ব্রেষ্ট মিল্ক পান করলে মাসল গ্রো করবে এই ধারণাকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ কুনাল সুদ বলছেন, 'মানুষের ব্রেস্ট মিল্কের প্রায় ৮৮ শতাংশ জল। আর ১০০ মিলিলিটার মাতৃদুগ্ধে প্রোটিন থাকে মাত্র ১.৫ গ্রাম, অন্যদিকে গরুর দুধে থাকে ৭.৯ গ্রাম প্রোটিন''।

মায়ের বুকের দুধে মাসল গ্রোথের ধারণা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিক এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ হলেও কিভাবে শুরু হল এই ট্রেন্ড? আমেরিকা সহ কয়েকটি দেশ (আমাদের দেশ সহ) এই প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ার পিছনে রয়েছে একটি ওয়েব সিরিজ ''দ্য বয়েজ''। পুঁজির অন্যতম পিলার অ্যামাজন গ্রুপের প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পায় ''দ্য বয়েজ''। এই সিরিজের সুপার হিরো 'হোমল্যান্ডার' নিজেকে ইমোশানালি ও ফিজিক্যালি ফিট রাখতে হিউমাস ব্রেস্ট মিল্ক পান করতেন। এটাকে লুফে নিল পুঁজির আরেক অন্যতম পিলার 'সোশ্যাল মিডিয়া'। ইনস্টাগ্রাম ও টিকটক এই বিষয়টিকে আমেরিকা সহ আরো অন্যান্য দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে ট্রেন্ড করে ফেলল মিথ্যার বেসাতি করে 'পুঁজির' সেবায়। এ্যামাজন, eBay এর মতো অনলাইন প্লাটফর্ম গুলো কেনাবেচা করছে 'ব্রেস্ট মিল্ক'।

একসময় দেখেছি মায়ের দুধের বদনাম করে বৃহৎ কোম্পানির অবৈজ্ঞানিক কৌটোর দুধ বেশী দামে গেলালো এখন তারাই আবার মাতৃদুগ্ধের মাহাত্ম্য প্রচার করে সেটাকেই রূপ দিল বাণিজ্যের মোড়কে। আমেরিকার 'ভাইস' পত্রিকার সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, অনেক নতুন মা এখন বুকের দুধ বিক্রী করে মাসে কয়েক হাজার ডলার আয়

করছেন। বিশেষ করে সন্তান প্রসবের পর প্রথম পাঁচ দিন মায়ের দুধে যে কোলোষ্ট্রাম নিঃসরণ হয়, তার চাহিদাই সব থেকে বেশী। সন্তানের পুষ্টি, বেড়ে ওঠা ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কোলোষ্ট্রাম সহ মায়ের দুধ অপরিহার্য। যার সাথে যোগ্য সঙ্গত করে প্রকৃতি নিজে। একটি মানুষের শরীরে ৩৯ ট্রিলিয়ন উপকারী ব্যাকটিরিয়া থাকে।

এই কোটি কোটি অনুজীব মানুষের নাক কান মুখ দিয়ে অন্ত্রে প্রবেশ করে। এরই একটা অংশ নিয়ে গড়ে ওঠে প্লেসেন্টাল মাইকোবারমা-নারীর গর্ভে প্লেসেন্টার জলীয় স্তরে ভ্রূণ ভেসে থাকে, যাকে পুষ্টির যোগান ও সমস্ত রকমের সুরক্ষা দেয় প্লেসেন্টাল মাইক্রোবায়াম। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়ায় এই উপকারী ব্যাকটিরিয়ার দল বাসা বাঁধে মায়ের স্তনে। তৈরী হয় প্রকৃতির অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ কোলেস্ট্রাম।

প্রথমত: সদ্যোজাতের পেটে জমা হয় প্রচুর পরিমাণ বিলিরুবিন। সদ্যোজাতের মায়ের বুকের প্রথম দুধ এইসব উপজাতগুলোকে মলের মাধ্যমে বার করে দেয়। দ্বিতীয়ত: প্রোটিন ও পুষ্টির যোগান দেওয়ার পাশাপাশি কোলোষ্ট্রাম বাচ্চাদের শরীরে প্রতিষেধক ও অ্যান্টিবায়োটিক তৈরী করে, যা একটি শিশুর সুস্থসবল ভাবে বেড়ে ওঠার প্রধান কারিগর।

প্রকৃতির এইসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়েও 'পুঁজি' স্ফীত হতে কার্পণ্য করছে না। 'পুঁজি' বিনিয়োগের নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজতে গিয়ে সদ্যজাত মা ও আজ পণ্য। আশঙ্কা করা কী অমুলক হবে যে একদিন অধিক দরিদ্র দেশের মায়েরা বাধ্য হবে সদ্যজাতের প্রাকৃতিক খাদ্যের একাংশ বিক্রী করে জীবনের অন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাবে? বেড়ে উঠবে অপুষ্টি নিয়ে একটি শৈশব?

(প্রতিবেদন- এই সময়, ২৭-১০-২৫)

ঘটনা-দুই: ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫। বরফ শীতল লাদাখ। গণবিক্ষোভের আগুন, কয়েক হাজার মানুষ পথে নেমে লেহ শহরে আগুন লাগিয়ে দিলেন। পুলিশের গুলিতে নিহত ৪ জন, আহত ৮০ জন। গ্রেপ্তার ৫০ জন। পরিবেশ আন্দোলনকারী বিজ্ঞানী সোনাম ওয়াঙচুক জনতার মারমুখী মেজাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সত্ত্বেও অনশনের মঞ্চ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রের পুলিশ।

চারটি দাবী ঘিরে এই বিস্ফোরক পরিস্থিতি:

এক, লাদাখের জনগণ পূর্ণ রাজ্যের স্বীকৃতি চায়,

দুই. লাদাখকে ভারতীয় সংবিধানের ৬ষ্ঠ তালিকায় অন্তর্ভুক্তি চায়, সেখানকার জনগণ,

তিন. বেকার সমস্য সমাধানের জন্য সেখানকার জনগণ পৃথক পাবলিকে সার্ভিস কমিশন চায়। উল্লেখ্য, গোটা দেশে যেখানে স্নাতকদের ১৩.৪ শতাংশ বেকার, লাদাখে সেই সংখ্যা ২৬.৫ শতাংশ,

চার. লাদাখের জনগণ বর্তমানে ১টি লোকসভার পরিবর্তে ২ টি লোকসভা চায়,

এবং এই চার দফা দাবি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ২০২৩ সালে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি তৈরী করা হয়।

সোনাম ওয়াঙ্কচুকের বক্তব্য: " Lakath figures at number 2 in the Country on terms of unemployment. We are without democracy after being downgraded from as State into a Union Teritory without Legislature. Are can't raise our issues and even the sixth Schedule has been denied"

সোনাম ওয়াংচুক কোনও বিপ্লবী দলের সঙ্গে বা কমিউনিট পার্টির সদস্য নন এবং বরং তিনি একজন গান্ধীবাদী

এমনকী কোনও চরম বৈপ্লবিক দাবীও তিন তোলেন নি। বর্তমান বছরের ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে তিনি ১২ জন পরিবেশবিদ নিয়ে দাবী আদায়ের জন্য পঞ্চমবারের মতো অনশনে বসেন। সোনাম ওয়াংচুকের অন্য পরিচয় তিনি শীতের হাত থেকে দেশের সেনাবাহিনীকে বাঁচানোর জন্য এক বিশেষ ধরনের ছাউনির উদ্ভাবক এবং বলা হয় তাঁর আদলেই 'থ্রি ইডিয়টস' এর র‍্যানচো চরিত্রটি নির্মিত। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম দুটি দাবী অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের স্বীকৃতিকে এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলের অন্তর্ভুক্ত হবার দাবী মানবেই না বলে ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে। এমনকী যারা সরকারকে কোনও ভাবে চ্যালেঞ্জ করছেনা এমনকী যাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেরও কোনও অভিযোগ নেই তাঁরা কেন গ্রেপ্তার হচ্ছে! এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেও রয়েছে আমার মূল নিবন্ধের উপাদান।

লাদাখে প্রত্যেক বছর টুরিষ্ট আসে ৩ লাখ। এখানকার প্রধান শিল্প কৃষি, হর্টিকালচার, দুধ ও ডেয়ারি, মাটি এবং মাটির নীচে এখানে রয়েছে লাইমস্টোন, জিপসাম, ডলোমাইট, কোয়ার্টজাইট, স্লেট, গ্রানাইট ইত্যাদি। বছরে ৩২০ দিন এখানে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন পাওয়ার কারণে এখানে বছরে প্রতিদিন গড়ে সোলার রেডিয়েশন হয় ২০২২ kwn/M2, যার ফলে সৌর শক্তি তৈরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল এটি। গত ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২৫, NTPC লাদাখে সোলার-হাইড্রোজেন ভিত্তিক একটি মাইক্রোগ্রিড থেকে ২০০ KW RE-RTC পাওয়ার কেনার জন্য ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছে। Power Purchase Agreement (NTPC Sigas power Purchase Agreement with Indian Army. Reort: February 4 2025, Economics Times)। ২৮ শে জুন ২০২৪, লাদাখে পাওয়ার বিতরণ কাঠামো উন্নত করার লক্ষ্যে Power Grid Energy Services Ltd থেকে মোট ১৩১.১৯ কোটি টাকার বরাত পেয়েছে Ramky Intrastructure Ltd. পরিকল্পনা হচ্ছে লেহ এবং কার্গিল জেলার মধ্যে ৭টি ৬৮ সাবস্টেশন তৈরী করা এবং ৭০ কিমি নতুন Distribution Line নির্মান করা। NTPC তো নয়, করাত পেল Ramky Infrastructue Limited নামে একটি বেসরকারী সংস্থা। Nippon Life India Asset Managerment Aid লেহ শহরে তার ১৬৭ তম শাখা খুলেছে। এটি একটি বেসরকারী মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি। (Nippon India MF sets foot in leh to financial inclusion, eyes expansion border in deepen regions. Report August 03, 2025, The Economics. Times) এরপর মাটির তলার অমুল্য খনিজ। আশংকা বুঝতে অসুবিধা হয় কী কেন ষষ্ঠ তপশীলের আওতায় ভাঙাচোরা স্বশাসনের স্বপ্ন শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে?

সদ্যজাতকে বঞ্চিত করে প্রকৃতিজাত মাতৃ দুগ্ধ এর প্রতিই যখন লুঠেরাদের নজর পড়েছে তখন গোটা পৃথিবীর জল-জঙ্গল-খনিজ-মাটি- কৃষি যে 'পুঁজির' নজর এড়াবে একথা কোনও সচেতন মানুষই বিশ্বাস করেনা। ফলে, একদিকে সংশ্লিষ্ট মূল অধিবাসীদের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ-এর মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রামটাই, আজ গোটা বিশ্বে সবচাইতে বড় থ্রেট। আর শিকড় হারানো মানুষদের তাই নিত্যনতুন উদ্ভাবিত অযৌক্তিক-অপ্রয়োজনীয় ইসুতে ভুলিয়ে রেখে রাষ্ট্র নায়ক বা ব্যস্ত সংশ্লিষ্ট দেশ বা রাষ্ট্রটিকে অর্থনীতির মূল্যায়নে বিশ্বের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় করার উদগ্র প্রতিযোগিতা। যে যত বেশী প্রতিযোগী সে ততবেশী পুঁজিপতিদের সেবক। এককথায় সকলে বেঁচে থাকার অধিকারটাকেই পুঁজিপতিদের কাছে বন্ধক রেখে চলছে দেশ গঠনের সুচতুর ঢক্কানিনাদ।

বহু আগেই বন্দনা শিবা তার 'বিশ্বায়ন ও পরিবেশ' প্রবন্ধে খুব সহজ সরল করে বিষয়টাকে বুঝিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবাস্তব সমাজ গঠনের অন্যতম কারিগর হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে ব্রাত্য করে ফেলা হয়েছে। বেশ কিছু পরিবেশ সচেতন মানুষকে ব্রাত্য করতে গিয়ে গোটা পৃথিবী খেটে খাওয়া, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল মানুষের পক্ষে কথা বলার মূল শিক্ষা ও দর্শনটাকেই অবাস্তব বলে প্রচার করায় আজ বিশ্বরাজনীতির

প্রথম ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অ্যাজেন্ডা। পৃথিবীর মূল প্রাকৃতিক সম্পদগুলিই হল স্থল, জল এবং পরিবেশগত বৈচিত্র। দারিদ্রের মূলধনও সেটাই। এই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক উপাদানগুলিই আজকে পণ্য। নতুন সম্পদ হিসেবে এই উপাদানগুলি উপজাতি ও কৃষক সম্প্রদায়ের অধিকার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিশ্বায়িত কর্পোরেশনগুলির নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হচ্ছে। জাতীয় নীতি ও আইন উলঙ্ঘন করে ছাঁটছে অথবা আইন-নীতি সংখ্যাজোরে সংশোধন করেও ঘটছে। প্রত্যেকদিন বিশ্বায়িত বাণিজ্যের চুক্তিগুলি জাতীয় সংবিধানকে অবনমিত করে, যার অর্থ নাগরিকদের জীবনের প্রতিটি অধিকার স্থল, জল এবং পরিবেশগত বৈচিত্রের প্রতি অধিকারের অবলুপ্তি। দুন উপত্যকা খননকার্য বন্ধ করে যে যুগান্তকারী রায় দেওয়া হয়েছিল তাতে এটা পরিষ্কার হয় যে জীবনের অধিকার কখনই বাস্তুতন্ত্র এবং প্রাকৃতিক উপাদানের অধিকারকে বর্জন করে বাস্তবায়িত হতে পারেনা। যেহেতু আলোচ্য খনন ঐ উপত্যকায় জলের ভান্ডার নষ্ট করছিল এবং জল বাদ দিয়ে জীবন হয় না, তাই প্রাণ বাঁচাতে ঐ রায় দেওয়াছাড়া আর কোনো রাস্তা ছিলনা। এই প্রথম বাণিজ্যকে পরিবেশগত ভারসাম্যের কাছে আমাদের দেশে নতি স্বীকার করতে হয়। বিপদও শুরু সেখান থেকে। নিজেদের সুবিধা মতো আইনপ্রণেতা তৈরীর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনেই অর্থ, কৌশলগত সুযোগ সুবিধা দেওয়াটাও পুঁজি বিনিয়োগের প্রাথমিক ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয়। বিশ্বায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যকে জীবনের উপরে স্থান দেয়। ফলে, নাগরিক অধিকারের পরোক্ষ কর্তা হয়ে বসছে কর্পোরেশনগুলো, প্রাকৃতিক উপাদানগুলির গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার অত্যাচার মুলক রাস্তাটি তাই আজ রাষ্ট্র কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত।

জমি

ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চম শিডিউল উপজাতিদের জীবনধারনের মূল উৎস, জমিকে সংরক্ষণ করে। আবার সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধন (১৯৯২) তফশিলী সম্প্রদায়ের জমিচ্যুতি এবং উপজাতিদের বেআইনিভাবে হারানো জমির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার যখন বিড়লাদের হাতে উপজাতি অধিকৃত জমি 'বক্সাইট' খননের জন্য লিজ দেয় তখন 'সমথা (SAMATHA)' নামে একটি সংস্থা সুপ্রিম কোর্টে এর বিরুদ্ধে কেস ফাইল করে। ১৯৯৭, সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে বেসরকারি সংস্থার হাতে খননকার্যের এই লিজ অসাংবিধানিক। এরপরেই ২০০০ সালে খনিমন্ত্রক একটি গোপন চিঠিতে (স্মারক ১৬/৪৮/৯৭-এম V1) কমিটি অব সেক্রেটারিজ কর্তৃক প্রস্তাব দেয় যে সংবিধানের পঞ্চম সিডিউলকে সংশোধন করা হোক যাতে সমথা রায়কে পাশ কাটানো যায়। সংবিধানে থাকলে তাকে তো আর কোনও কোর্ট অসাংবিধানিক বলতে পারবে না। কী নির্মমতা, সংবিধান প্রণেতাদের মুল্যবোধ আবেগ জনিত ধারা অস্বীকার করে শুধুমাত্র লিখিত ভাষাগত সংবিধান তৈরীতেও রাষ্ট্রনায়করা রাজী। শুরু হয়, 'ক্যাম্পেন ফর্ পিপলস্ কন্ট্রোল ওভার ন্যাচারাল রিসোর্স'-এর ব্যানারে তীব্র প্রতিবাদ। আইসভায় ঝড় ওঠে। সংশোধন সাময়িকভাবে রদ হয়। এমনকি রাষ্ট্রপতি ২০০১ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসের ভাষণে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, ''ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন এই মত পোষণ না করে যে ভারতীয় রাষ্ট্র সবুজ ধ্বংস এবং নিরীহ আদিবাসী হত্যার উপর নির্মিত হয়েছে।' বাড়তে থাকে চাপ। 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' এবং বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার নীতির হাত ধরে। ভাবখানা এমন যে দরজা যখন খুলেছ, ঢুকতে কেন দেবে না? ঐবছরেরই ১০ ই ডিসেম্বর (২৬শে জানুয়ারীর পর ১০ই ডিসেম্বর) সুপ্রিম কোর্ট বালকোর বেসরকারিকরণকে সমর্থন জানায়। যেহেতু পঞ্চম শিডিউল উপজাতিদের তাঁদের জমির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রন দেয়, তাই সরকারি মালিকানায় বালকোর উপস্থিতি উপজাতিদের। সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে ট্রাস্টি হিসাবে সরকারকে উপস্থাপিত

করেছিল। মালিকানার পরিবর্তনে উপজাতিদের সঙ্গে সংবিধান সমন্বিত এক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যাঁদের জমিতে বালকোর অবস্থান সেই উপজাতিদের কোনও কথাই শোনা হয়নি। ফলে, আদৌ কী এই রায় সাংবিধানিক, এ প্রশ্ন ওঠা সঙ্গত ছিল কিন্তু সুপ্রিম কোর্টকে সে প্রশ্ন করার অধিকার ভারতের সংবিধান ভারতের জনগণকে দেয় নি। সুপ্রিম কোর্ট বলছে, ''অর্থনৈতিক নীতি যা বেসরকারিকরণ এবং উদারীকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত সে ব্যাপারে কোনও ভারতীয় কোর্টই হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অর্থাৎ জল, জঙ্গলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের বেসরকারিকরণকে কোনও চ্যালেঞ্জ করা যাবেনা। শ্রমিকের স্বাস্থ্য, অধিকার, খাদ্য ও শিক্ষার প্রতি অধিকারও যদি কখনও ক্ষতিগ্রস্থ হয়, সেই ঘটনাকেও তাহলে পরোক্ষে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। ''দোহা ঘোষণা'' অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদ, মুক্ত বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং এবং এ ধরনের বিশ্বায়িত চুক্তিগুলি এক্সিকিউটিভরা সই করে দেশে দেশে কাজে রূপান্তরিত করেছে এবং করছে; আগে, পরে ''স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম'' এর হাত ধরে দেশে দেশে আইন সংশোধন করা হচ্ছে অথবা নতুন আইন তৈরী করা হচ্ছে। গোটা আইনসভায় জনসাধারণ পাঠাচ্ছে নিজেদের প্রতিনিধি আর সেই প্রতিনিধিরা প্রতিনিধিত্ব করছে আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিদের পক্ষে। অদ্ভুত একটি রায়, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট বলছে ''বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতির গুণগত তারতম্য নির্ধারণ করা কোর্টের কাজ নয় বরং কোনও অর্থনৈতিক নীতির নির্ভুলতার বিচার করার জন্য আইনসভা আছে, কোর্ট নয়। তাহলে অবশিষ্ট থাকে এইটুকুই যে একমাত্র আইনসভার পরিবর্তন ঘটিয়েই জনগণ নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে পারে এবং সে দায় থাকলেও প্রকৃত অর্থে জনগণের সে ক্ষমতা কতোটুকু সে নিয়ে বিতর্ক থাকলেও পথ মাত্র একটিই। জমির উপর কর্পোরেট পুঁজির লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে বেশী কথা লেখার আদৌ কোনও প্রয়োজন নেই কারন আমরা বিভাগীয় স্তরে কর্মসূত্রে সে ব্যাপারে সম্যক ওয়াকিবহাল এবং অভিজ্ঞ। ফলে এই প্রসঙ্গটি শেষ করি একটি উদাহরণ দিয়ে। প্রাকৃতিক সম্পদ না হয় মুক্ত বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু জমির উপর কৃষক যখন ফসল ফলায় নিজের শ্রমের বিনিময়ে, সেই ফসলও কী প্রাকৃতিক?

ঘোষণায় না থাকলেও ব্যবহারিক ভাবে সেটিকেও ধরে নেওয়া হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবেও। জঙ্গল, জল, খনিজ তো না হয় গেলই, স্থলভাগের উপরিভাগে শ্রমের বিনিময়ে তৈরী কৃষি ও আজ প্রাকৃতিক সম্পদের তালিকায়। ভারতীয় উপমহাদেশ খুব ভাল মানের সুবাসিত বাসমতী চালের সর্ববৃহৎ উৎপাদক এবং রপ্তানিকারক। বছরে এই রিজিয়নে ৬ লাখ ৫০ হাজার টন বাসমতী উৎপাদিত হয়। ধান চাষের জমির ১০ থেকে ১৫ শতাংশ অংশ এই চাল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাসমতী সহ অন্যান্য চাল ৮০ টির বেশী দেশে রপ্তানি করা হয়। বাৎসরিক বাসমতী রপ্তানি হয় ৪ লাখ থেকে ৫ লাখ টন। মধ্যপ্রাচ্যে যায় ৬৫ শতাংশ, ইউরোপে ২০ শতাংশ এবং ইউ এস এ তে যায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। গ্লোবাল বাজারে ভারতীয় বাসমতীর দাম সর্বাধিক। আমাদের দেশের কবিতায় লোকগাথায় বাসমতীর উল্লেখ। হরিয়ানা এগ্রিকালচারাল ইউনিভারসিটিতে রক্ষিত কবি বরিস্ শা্-এর রচনা 'হীর ঝনঝা' বাসমতীর সর্বপ্রাচীন উল্লেখ বহন করে, যা রচিত হয়েছিল ১৭৬৬ সালে। প্রাকৃতিকভাবেই এই সুগন্ধী চাল ভারতীয় অভিজাতরা সগর্বে রক্ষা করে এসেছেন বহু প্রাচীনকাল থেকেই। একসময় এই চাল ছিল বিদেশী অভিজাতদের ঈর্ষার কারণ। ঘরোয়া উৎপাদন পদ্ধতি বাসমতীর উৎকর্ষের কারণ অথচ ১৯৯৭ এর ২রা সেপ্টেম্বর টেকসাসের বহুজাতিক কোম্পানী রাইসটেক বাসমতীর উপর পেটেন্ট পেয়ে যায় (নং ৫৬৬৩৪৩৪)। বাজারজাত হতে শুরু করল রাইসটেকের বাসমতী, টেকুমতী এবং যশমতী ব্রান্ড নামে বাসমতীর ব্যবসা। অথচ সেটি আদপেই রাইসটেসকের উদ্ভাবনই নয়। অবশেষে দীর্ঘ আইনী লড়াই এর পর ২০০১ সালের ৪ঠা আগস্ট ইউ, এস পেটেন্ট অফিস রাইসটেকের বাসমতীর ৯০ শতাংশ কেটে নিতে বাধ্য হয়।

জল

WTO র দোহা মিনিস্টিরিয়াল বৈঠকে প্রতিযোপিতা, বিনিয়োগ, সরকার কর্তৃক আহরণ এবং বানিজ্য-সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে শেষ মুহূর্তের দরাদরিতে ধনী, উত্তরের দেশগুলি ক্ষমতার জোরে আর্টিকেল ৩১ (৩) ঢুকিয়ে নিয়ে সফল হয়। এই অনুচ্ছেদের বক্তব্য হলো, পরিবেষাগত দ্রব্য এবং পরিষেবার উপরে শুল্ক হ্রাস এবং সম্ভব হলে শুল্ক বিলোপ। পরিবেশগত সম্পাদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান সম্পদ হলে জলসম্পদ। 'জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস'এ বেসরকারীকরণের আরেকটি উপাদান হলো জলকে পরিষেবা ক্ষেত্রর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। আমাদের দেশে বহুদিন ধরেই তিরুপুর, পুনে, ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, হায়দারবাদ জল সম্পদের বেসরকারিকরণ শুরু হয়ে গেছে। জল ব্যবসায়ীরা হিসাব কষে দেখিয়েছে জল বিক্রী করে এদের ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি লাভ সম্ভব একবছরে। সুয়েজ, ভিভেনডি, আগুয়াল দ্য বার্সেলোনা, টেমস ওয়াটার, স্যর, বেশটেল, এনরন, মনসানটো বহুজাতিক সংস্থাস্তলোর হাতেই পৃথিবীর ৭০ শতাংশ বিক্রয়যোগ্য জলসম্পদ। এক্ষেত্রে বেসরকারিকরনের ধাপগুলো বেশ চতুর এবং ছদ্মবেশী। প্রথমে তৈরী হয় স্লোগান ''প্রকৃতিতে জল সীমিত; তার অপচয় রদ কর প্রয়োজন।'' এই স্লোগানের আড়ালে প্রবেশ ঘটে বেসরকারি কোম্পানীর। স্থানীয় পঞ্চায়েত অথবা প্রশাসনকে সাথে নিয়ে তৈরী হয় 'পানি পঞ্চায়েত'। আর এই মহানকাজই কয়েক' বছর বাদে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাটির ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়। আসল উদ্দেশ্য জলকে সাধারণ সম্পদ থেকে বিক্রয়যোগ্য এবং বেসরকারি সম্পত্তিতে পরিণত করা। ১৯৮৯ থেকে ২০০২ সময়কালের মধ্যে পাওয়া একটি পরিসংখ্যান আলোচনায় নেওয়া যেতে পারে। ফরাসি বেসরকারি সংস্থা, লিওনাইজ দ্য ইউ দুমেজ এবং রমপ্যানি জেনারেল দ্য ইউ, ব্রিটিশ বেসরকারি সংস্থা টেমস ওয়াটার এবং নর্ম ইয়েষ্ট ওয়াটার, স্পেনের কোনাল ইসাবেল একত্রে কনসটিয়াম তৈরী করে, বিশ্বব্যাঙ্ক পরিচালিত জল বেসরকারিকরণে প্রকল্পের পরিচালন ভার পাওয়ার জন্য। আর্জেন্টিনায় তাদের প্রকল্প শুরু হলে, বুয়েনস আয়ারস্ এর রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা ওবরা স্যানিটারিয়াম দ্য লা নেশিওন (OSN) এ একধাক্কায় কর্মীর সংখ্যা হ্রাস পায় ৭৬০০ থেকে ৪০০০এ। এই ৩৬০০ কর্মীর কর্মচ্যুতি প্রকল্পটির বিরাট সাফল্য হিসেবে দেখানো হয়, দেখানো হয় নি যে যে, ঐ প্রথম বছরেই আর্জেন্টিনায় জলের দাম বেড়েছিল ১৩.৫ শতাংশ। চিলিতে ফরাসি সংস্থা সুয়েজ লিওনাইড দ্য ইড ব্যবসা শুরুই করেছিল ৩৫ শতাংশ লাভের টার্গেট সামনে রেখে। ক্যাসাব্লাঙ্কাতে জলের দাম যখন বাড়ছে ৩গুণ, ব্রিটেনে জল এবং নিকাশী ব্যবস্থার বিল ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৪-৯৫ এর মধ্যে বেড়েছে ৬৭ শতাংশ। সাথে জল-যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ার ঘটনা বেড়েছিল ১৭৭ শতাংশ। জোহানেসবার্গের জল সরবরাহ ব্যবস্থা ততদিনে সুয়েজ লিওনাইড দ্য ইউ অধিগ্রহণ করছে। ঐ একই সময়ে নাইরোবিতে জলের দাম বেড়েছিল ৪০ শতাংশ, এবং সাড়ে তিনহাজার পৌরকর্মীকে কর্মচ্যুত করে সেখানে বসানো হয়েছিল ৪৫ বিদেশী কর্মী। ঐ সময় গিনির মতো দেশেও কর্মী কমানো হয়েছিল ৫০ শতাংশ, জলের দাম বেড়েছিল ৩ গুণ। একমাত্র নিউজিল্যান্ড একটি মাত্র দেশ যারা লড়াই করে রুখে দিয়েছিল লুঠেরাদের। সাল ২০০০। ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন কর্তৃক বন্টিত বিশ্ব অর্থ তহবিলের ৪০টি ঋণের মধ্যে ১২টিতে শর্ত হিসাবে জলের আংশিক বা পূর্ণ বেসরকারিকরণ রাখা হয়েছিল। ঋণযোগ্য হতে গিয়ে, আফ্রিকান সরকারগুলো প্রতিনিয়ত জলের বেসরকারীকরণজনিত চাপের মুখে পড়ছে। শিশুর দুধতো দুরের কথা, প্রতিদিনি জলের যোগান দেবার ক্ষমতাও যেখানে অধিকাংশ বাবা-মার নেই। শুধুমাত্র ঘানায় এই বেসরকারিকরণের ফলে জলের দাম ঐ সময়কালে বেড়েছিল ৫০ শতাংশ।

জল নিয়ে আসল উল্লেখযোগ্য লড়াই

বলিভিয়ার কোচাবাম্বার। মরুভূমি অঞ্চল, জলও দামি। ১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক কোচাবাম্বার পৌরজল সরবরাহ কোম্পানিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেবার জন্য প্রস্তাব দেয়, বেশটেলের সহযোগী সংস্থা ইন্টারন্যাশানাল ওয়াটারকে এক ছাড়পত্রর মাধ্যমে। শুরু হয় বেসরকারিকরণ। সরকারি ভর্তুকি হয় বন্ধ। কোচাম্বার ন্যূনতম মজুরী মাসে তখন ১০০ ডলারের কম, জলের বিল পৌঁছয় ২০ ডলারে—যে ব্যয় পাঁচজনের একটি পরিবারের দু-সপ্তাহের খোরাকি। জানুয়ারি ২০০০। নাগরিকরা একটি সংগঠন তৈরী করে ''লা কো-অর্ডিনেশন দ্য এফেন সা ডেল আগুয়ার দ্য লা ভিডা বা দ্য কোয়ালিশন ইন ডিফেন্স অফ ওয়াটার এন্ড লাইফ।'' শুরু হয় গণবিক্ষোভ। ৪ দিন দোকান সব বন্ধ। একমাসের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বলিভিয়াবাসী কোচাবাম্বায় মার্চ করে যান। পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট। জমায়েতে কোচাবাম্বা ডিক্লারেশন তৈরি হয়, বিশ্বজনীনভাবে জলের প্রতি আধিকারকে সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে। সরকার জলের দাম পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাময়িকভাবে বিক্ষোভ প্রশমিত করে কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনা। ২০০০ এর ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয় অহিংস মিছিল। দাবী, পানীয়জল এবং পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার উপর হওয়া ঐ আইন রদ করা, বেসরকারিকরণের অর্ডিনান্সগুলো রদ করা এবং জলচুক্তি বিলোপ এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ সমন্বিত একটি জল সম্পদ আইন প্রণয়ন করা। শ্লোগান: জল প্রকৃতির দান, বাণিজ্যের নয়। এপ্রিল ২০০০। বলিভিয়ার সরকার বাজারি আইন দিয়ে বিক্ষোভ দমন শুরু করে। কিছু বিক্ষোভকারী শহীদ হন, অনেকে গ্রেফতার হন, মিডিয়ার স্বাধীনতা খর্ব করা হয় কিন্তু অবশেষে ১০ই এপ্রিল জনগণই জয়ী হয়। আগুয়াস ডেল তুনারি এবং বেশটেল বলিভিয়া পরিত্যাগ করে। কর্পোরেশন এবং বাজারের হাত থেকে জল উদ্ধার করে, বলিভিয়ানরা প্রমাণ করেন যে বেসরকারিকরণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ কর্পোরেট হাতে যাওয়া কোনো অনিবার্য ঘটনা নয় এবং তাকে গণ আন্দোলন দিয়ে প্রতিহত করা যায়।

জঙ্গল

বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রাক শিল্প স্তর থেকে ১.৫°C এর মধ্যে রাখার জন্য চুক্তি আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বাক্ষরিত। যদিও জলবায়ু সংকট প্রশমনে বনভূমির ভূমিকা ভারত সহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে গুরুত্ব পায়নি। অথচ গবেষণা বলছে ২০৩০ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ কার্বন নিষ্ক্রমন প্রশমন করা যায় একমাত্র বন সুরক্ষা ও বন পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে। বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ, বন পুনরুদ্ধার এবং ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে জলবায়ু প্রশমনের কৌশল হিসাবে, সেটা সম্ভব কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন এবং গ্রিন হাউস গ্যাস নিষ্ক্রমণ কমানোর মাধ্যমে। অন্যদিকে এই ব্যবস্থা জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের রক্ষা করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ম্যানগ্রোভের জঙ্গল ও প্লাবনভূমি প্রাকৃতিক সুরক্ষা হিসাবে কাজ করতে পারে চরম আবহাওয়ার ঘটনা ও সমুদ্রস্তর বৃদ্ধির ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে। বলা হয়, থত বেশি বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র থাকবে তত বেশি বাস্তুতন্ত্রের প্রজাতির সহ্য ক্ষমতা বাড়বে। বাস্তুতন্ত্রের এই টেকসই পরিচালনা গ্রিন হাউস গ্যাস নিষ্ক্রমণ কমায় এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে, এমন কিছু নীতি ও কর্মসূচী নেওয়া প্রয়োজন যাতে জীববৈচিত্র ক্ষতি না হয় এবং স্থানীয় মানষের জীবনযাত্রায় কুপ্রভাব না পড়ে। সেই পরিপ্রেক্ষিত-এ সরকার কী কী নীতি বা কর্মসূচী নিয়েছে জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণ বা জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে এবং স্থানীয় মানুষের যোগদান ও জীনযাত্রার মান উন্নয়নে, তার একটি পর্যালোচনা চলছে।

জঙ্গল ও জলাভূমি 'কার্বন স্টক' এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং নিরাপদ ও সাশ্রয়ী হিসাবে কাজ করতে

পারে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে। Forest Restoration বিশ্বব্যাপী জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের মত। IPCC র রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী বন, বাতাসের কার্বনের এক তৃতীয়াংশ শোষণ করতে পারে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৫০ মিলিয়ন হেক্টর জঙ্গল পুনরুদ্ধারের জন্য জার্মান সরকার ও IUCN উদ্যোগ নিয়েছিলেন যা Bonn Challege হিসাবে পরিচিত। ভারত, চিন, ব্রাজিল সহ প্রায় ৪৩ টি দেশ ৩০০ মিলিয়ন হেক্টর নষ্ট হয়ে যাওয়া বন পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকার করেছিল এবং দেশগুলির রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ঐ জমির প্রায় অর্ধেক অংশে বাণিজ্যিক গাছ, যেমন অ্যাকাসিয়া, ইউক্যালিপটাস বা রাবার গাছ লাগানো হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে Forest Restoration প্রকল্পটিও কর্পোরেট কৌশলে কর্পোরেট সংস্থা দখল করে বসে আছে মুনাফা লাভের আশায়। এইসব দ্রুত বৃদ্ধির প্রজাতির গাছ বাণিজ্যিক দিক থেকে লাভজনক। ব্রাজিলে, ৮২ ভাগ অঙ্গীকারবদ্ধ জমিতে এই একই প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছে Natural forest এর পরিবর্তে, যেটা চীনে ৯৯ শতাংশ অথচ Bonn Challange এর অংশগ্রহণকারী দেশেগুলো নষ্ট হওয়া বনজমির এক-তৃতীয়াংশ জমিতে সহজ ও কম খরচে কার্যকর বহু প্রজাতির প্রাকৃতিক পুনর্জন্মের অঙ্গীকার করেছিল। Monoculture Plantation এর কার্বন ধরে রাখার ক্ষমতা Natural Plantation এর চাইতে ৪০ শুন কম। ভারতের পশ্চিমঘাট এ একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে প্রাকৃতিক জঙ্গল প্রতি হেক্টরে ৩০০ টন কার্বন ধরে রাখতে পারছে যা সেগুন এবং ইউক্যালিপটাস থেকে বহুগুণ বেশী। অতএব কার্যক্রম রূপায়ণে আমার লক্ষ্যটা কী-সেটাই মূল বিচার্য। আমাদের দেশে যে নীতি, প্রাকৃতিক বনকে প্লানটেশনে পরিণত করে অর্থাৎ কমপেনসেটারি অ্যাফরেস্টেশান কার্যক্রম, সেটা একদিকে যেমন কার্বন ধরে রাখার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক অন্যদিকে জীব বৈচিত্রের সমস্যা তৈরীতে সহায়ক।

আমেরিকার একটি গবেষণা সংস্থা হিসাব করে দেখিয়েছে যে, নষ্ট হয়ে যাওয়া বনজমিকে পুনরায় বৃদ্ধি ঘটানোর যদি সুযোগ দেওয়া হয় সেই বনজমি বার্ষিক ৩ বিলিয়ন টন কার্বন শোষন করতে পারে ৬০ বছর ধরে। ২০২০ সালের World Economic Forum এর 'Trillion Trees Campaign' অথবা world Conservation Society এবং World Wild Fund এর যৌথ উদ্যোগে 'Trillion Trees'-সহ সকল প্রচার এবং উদ্যোগ এক বা দুই প্রজাতির প্লান্টেশন কে উৎসাহিত করেছে সম্পূর্ণ সামাজিক কাজের আড়ালে ব্যবসায়িক মুনাফার স্বার্থে। ২০১৯ এ নেচার পত্রিকা জানাচ্ছে যে যদি ৩৫০ মিলিয়ন হেক্টর নষ্ট হয়ে যাওয়া বনজমি প্রাকৃতিক নিয়মে পুণর্জন্ম পায় তাহলে ঐ জমি প্রায় ৪২ বিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন শোষণ করতে পারবে ২১০০ সালের মধ্যে। অন্যদিকে ঐ জমিতেই যদি এক প্রজাতির গাছ লাগানো হয় তার কার্বন ধারণ ক্ষমতা হবে ১ বিলিয়ন টন। চিনে Grain for Green' কার্যক্রমে ১০০ মিলিয়নের বেশী চাষীকে গাছ লাগানোর জন্য উৎসাহ ভাতা দেওয়া হয়েছিল যার দ্বারা ১০, ৮০০ বর্গমাইল বন পুনরুদ্ধার সম্ভব হলেও জৈববৈচিত্র গিয়েছিল কমে। অন্যদিকে কোষ্টারিকা সরকার যখন বর্জ্য প্রজাতির জঙ্গল তৈরী করার উৎসাহ ভাতা দিয়েছিল তা দিয়ে, শতকরা ৫০ ভাগের বেশী বন পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছিল। নেপালের ১৭,০০০ সম্প্রদায়-গোষ্ঠী যাদের বন রক্ষার অধিকার দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে দেখা গেছে তিন দশক পরে ২০ ভাগ জঙ্গল বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১ সালে আমাদের দেশে গভীর বনভূমির পরিমান ছিল ৪, ১৬,৮০৯ বর্গকিমি এবং ২০২১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে বনভূমির পরিমাণ ৭,১৩,৭৮৯ বর্গ কিমি যার মধ্যে গভীর বনভূমির পরিমাণ ৪,০৬, ৬৬৯ বর্গ কিমি এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া বনভূমির পরিমাণ ৩,০৭,১২০ বর্গ কিমি। ফলে ২০ বছরে দেশের বনভূমি বেড়েছে ৩৮,২৫১ বর্গ কিমি এবং গভীর বনভূমি আসলে কমেছে ১০, ১৪০ বর্গ কিমি।

অতএব ভারতের গভীর বন দ্রুত শেষ হচ্ছে। এই ধরনের বনভূমির নীচে রয়েছে মুল্যবান খনিজ পদার্থ। জিডিপি

দ্রুত বৃস্থির লক্ষ্যে পরিবেশগত ক্ষতির মুল্যায়ন সঠিকভাবে না করেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে দ্রুত ছাড় দেওয়া হচ্ছে। লোকসভায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৮ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ২৫,৮০০ হেক্টর বনভূমি বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য নেওয়া হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালেই নেওয়া হয়েছে ৪৯৬ বর্গ কিমি বনভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের নামে। শুধুমাত্র ওড়িশার সম্বলপুরে একটি কয়লা খনি প্রকল্পের জন্য ১,৩০,৭২১ টি গাছ (১০.৩৮ বর্গ কিমি বন) কাটা হবে বলে ধার্য হয়েছে। খনিজ ও লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ বিভিন্ন রাজ্যে বহু প্রকল্প আটকে রয়েছে প্রতিরোধের ফলে। হিমাচল প্রদেশের কিন্নরে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, ছত্তিশগড়ের হাসদেও ফরেষ্ট তিনটি খনন প্রকল্প বা ওড়িশার পসকো প্রকল্প। এই প্রাকৃতিক বনভূমি তুলে দেওয়া হচ্ছে মূলত বেসরকারী সংস্থাকে খনন অথবা শিল্প স্থাপনের জন্য। সবই চলছে Pro-investment climate এবং Ease of doing business এর নামে। সম্প্রতি বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের আনা বন সুরক্ষা আইন ১৯৮০ র নিয়মাবলী আমূল পরিবর্তন করার ফলে গতিবৃদ্ধি হচ্ছে বনভূমির হস্তান্তর প্রক্রিয়া। ২০২২ এর ২৮ শে জুন প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হচ্ছে, জঙ্গলের জমিতে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ বা খনন কাজে বেসরকারি সংস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি অনুমতি দেবে, এর জন্য আদিবাসীদের অম্মতি নেবার প্রয়োজন নেই। সরকার অনুমতি দেবে বন উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে যেখানে সরকারি আমলাদের প্রাধান্যই বেশি। আদিবাসীরা জঙ্গলের মুখ্য অংশীদার হওয়া স্বত্ত্বে কমিটিতে তাঁদের স্থান নেই। ফলে মূলাবাসী বা আদিবাসী, যাদের জীবন, জীবিকা এবং সংস্কৃতি জঙ্গলের জমি ও তার সম্পদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অন্যদিকে বহুবছর ধরে গড়ে ওঠা জঙ্গল, ধ্বংসের ফলে জৈববিচিত্র কমবে, জলবায়ু পরিবর্তন রোধের ক্ষমতাও হ্রাস পাবে। অথচ বনসুরক্ষা আইন ১৯৮০ অনুযায়ী, যে পরিমাণ বনভূমি হস্তান্তরের ছাড়পত্র দেওয়া হবে, বনের বাইরে সমপরিমাণ জমির ব্যবস্থা করার কথা ছিল এবং সেই জমিতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কম্পেনসেটরি অ্যাফরেস্টেশন' করার কথা স্বীকৃত ছিল। এবং এরজন্য ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে একটি আইনও তৈরী হয়েছিল, ''কম্পেনসেটরি অ্যাফরেস্টশন অ্যাক্ট ২০১৬', নষ্ট হওয়া প্রাকৃতিক বনের মূল্য থেকে পাওয়া অর্থ ঐ কাজে লাগানোর কথা স্বীকৃত হয়েছিল। নতুন বিধিতে প্রাকৃতিক জঙ্গল ও জৈববৈচিত্রের ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ মূল্য বাড়িয়ে হেক্টর প্রতি প্রায় ১১ লাখ থেকে ১৬ লাখ করা হয়েছে কিন্তু সেই যে বনদপ্তর যে অ্যাফরেস্টশনের ব্যবস্থা করবে তা মূলত 'মোনোকালচার' যার ব্যবসায়িক মূল্য অসীম হলেও জলবায়ু পরিবর্তন রদে খুব সামান্যই ভূমিকা এবং অনেকক্ষেত্রে বিপরীত ভূমিকাই পালন করবে। ২০৩০ সালের মধ্যে ২৫০ কোটি টন কার্বন সিঙ্ক' তৈরি করার লক্ষ্যে ভারত সরকার 'গ্রিন ইন্ডিয়া মিশন' এর অধীনে জাতীয় সড়কের দুধারে ১,৪০,০০০ কিমি বরাবর এবং গঙ্গার ধার বরাবর গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে কিন্তু প্রাকৃতিক বন তৈরীর উদ্যোগ সেটা আদৌ যথেষ্ট নয় এবং এই সামান্য কার্যক্রমেও স্থানীয় অধিবাসীদের কোনও ভূমিকা থাকবে না। ফলে আশংকা আকাশ প্রমাণ দুর্নীতির। ২০০৯-২০২০ সালের মধ্যে আনুমানিক ৫৯,০০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যে ব্যয় করা হয়েও গেছে। এক গবেষক সংশ্লিষ্ট পোর্টালের ৬ টি রাজের ২০০০ নথি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, এই বনসৃজন যেসব এলাকায় করা হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে, সরেজমিনে সেখানে কোনও গাছের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকী ভারতীয় বন সর্বেক্ষণের নোটে বলাও হয়েছে যে, রাজ্য বনদপ্তরগুলোর পাঠানো বনসৃজনের তথ্য শতকরা ৫৫ ভাগই অসত্য। ফলে একদিকে উন্নয়নের নামে জঙ্গল ধ্বংস, মূলবাসীরা হচ্ছেন বাস্তুহারা অপরদিকে মরেনসেটারি অ্যাফরোস্টেশান' টুকুও করা হচ্ছে না। জঙ্গলের সাথে আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং উল্লেখযোগ্য একটি সমীক্ষা যে আদিবাসী এলাকার জঙ্গল ধ্বংসের পরিমান, বনদপ্তর পরিচালিত জঙ্গল এলাকার চাইতে কম। কারণ, ২০০৬ সালে পাশ হওয়া বন অধিকার আইন ভারতে বন পরিচালনার একটি দিকনির্দেশক

আইন। যেখানে ব্রিটিশ আমল থেকে, স্বাধীন ভারতেও বিভিন্ন আইনের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের জল-জঙ্গলের অধিকার যেভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে এই আইনে তার প্রতিকার চাওয়া হয়েছিল। প্রথমত: আদিবাসীরা যে যেখানে বংশানুক্রমে বসবাস ও চাষাবাদ করছে সেই জমির আইনগত স্বীকৃতি। দ্বিতীয়ত: জঙ্গলের যে Minor forest Produas উপর নির্ভর করে আদিবাসীরা জীবনযাপন করে আসছে তার আইনসঙ্গত অধিকার। তৃতীয়তঃ আদিবাসীরা যে জঙ্গল পুরুষানুক্রমে পরিচালনাস, রক্ষা ও ব্যবহার করে আসছে তার অধিকার তাদের ফিরিয়ে দেওয়া। জঙ্গলের কী কী সম্পদ কখন কীভাবে ব্যবহার করা যাবে, কীভাবে কীভাবে প্রাণী প্রাণী সম্পদ রক্ষা করতে হবে এর সিদ্ধান্ত জাবার দায়িত্ব সেই এলাকার অধিবাসীদের হাতেই অর্পন করা হয়েছিল।

এই আইন নিঃসন্দেহে প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়ন ও জীবনযাত্রার উন্নতিতে নিজেদের অধিকার স্বীকৃত করেছিল কিন্তু বনদপ্তর কোনওভাবেই জঙ্গলের উপর তাদের কর্তৃত্ব ছাড়তে রাজী নয়, তাদের যুক্তি আদিবাসীদের বন পরিচালনার ক্ষমতা নেই। অধিকার পেলে আরও জঙ্গল ধ্বংস হবে অথচ যেসব জায়গায় বন পরিচালনার অধিকার আদিবাসীদের দেওয়া হচ্ছে, তথ্য বলছে অত্যন্ত সফলতার সেখানে তারা কাজ করেছে। মহারাষ্ট্রের গডচিড়ৌলিতে শুধুমাত্র বাঁশ গাছ বিক্রী করে তারা প্রচুর রোজগার করছে। গুজরাটের নর্মদা জেলার ২০ টি গ্রামের মনিষ বাঁশ গাছ চাষ করে এবং বাঁশ বিক্রী করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছে। অন্ধ্রপ্রদেশের সিরমানপল্লীর গ্রামে অধিবাসীরা সমষ্টিগত জঙ্গলের অধিকার পাওয়ার পর আনুমানিক ২৬ লাখ টাকার বাঁশ বিক্রী করেছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ঐ টাকার অর্ধেক তারা জঙ্গলের উন্নতিতে ব্যয় করবে। ওড়িশার সিমলিপাল টাইগার রিজার্ভ 'এ ২১ টি গ্রামের অধিবাসীরা চিরাচরিত পদ্ধতির উপর নির্ভর করে সম্প্রদায়গত সংরক্ষণ ও পরিচালন পরিকল্পনা তৈরী করেছেন বনদপ্তরের সহায়তায়। কর্নাটকের একটি 'টাইগার রিজার্ভে ৩২টি গ্রামের সলিগা আদিবাসীরা একত্রিত হয়ে বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা করেছেন এবং তাদের বিচরণ ক্ষেত্র পর্যন্ত চিহ্নিত করেছেন। ফলে, উদাহরণগুলো বুঝিয়ে দেয় যে ক্ষমতা এবং অধিকার পেলে জঙ্গলের আদিবাসীরাই জঙ্গল সফলভাবে রক্ষা করতে পারে এবং তার অন্যতম কারণ সেটাই তাদের রুটি-রুজির একমাত্র পথ। পরোক্ষে যা জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে এবং জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণে আদিবাসীদের সমষ্টিগত ভাবে জঙ্গলের সম্পদের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হতে পারে। কিন্তু জঙ্গলে রয়েছে মূল্যবান ব্যবসায়িক সম্পদ এবং জঙ্গলের তলায় রয়েছে আরও মূল্যবান ব্যবসায়িক উপাদান ফলে কর্পোরেট লোলুপতার বিপক্ষে যে লড়াই সেই লড়াইতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার কার প্রতিনিধিত্ব করবে—তারই উপর নির্ভর করে সবটা।

তথ্যসূত্র

১. বিশ্বায়ন : ভাবনা-দুর্ভাবনা
২. ইকনমিক টাইমস পত্রিকা
৩. টাইমস পত্রিকা
৪ সরেজমিন পত্রিকা
৫. বিপ্লব সাহা
৬. বিধানকান্তি দাস

ভারতের প্রাকৃতিক দুর্যোগ—মনুষ্যসৃষ্ট না কি প্রকৃতির তান্ডবলীলা

কানুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক ঘটনা **এক**—মে (২০২৫) মাসের শেষ সপ্তাহ নাগাদ মৌসুমি বৃষ্টিপাতের প্রভাবে কেরালা ও কর্ণাটক উপকূলে ব্যাপক বন্যা এবং ভূমিধস দেখা দেয়। রাজ্য সরকারের তরফে শতাধিক বন্যাকবলিত মানুষকে কেরালার ত্রাণশিবিরগুলিতে স্থানান্তরিত করা হয়। একই সাথে আসামের গুয়াহাটিতে ভূমিধসের প্রভাবে পাঁচ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। মিজোরামে প্রবল বর্ষণে বাড়ি ধসে পড়ে পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ডেও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির কথা জানা গেছে।

সাম্প্রতিক ঘটনা **দুই**—৩ অক্টোবর, ২০২৫ রাতে শুরু হওয়া বৃষ্টিপাতে পাহাড়ের রানী দার্জিলিং শহরকে ঘিরে ব্যাপক ধ্বংসলীলা ঘটে। ছয় ঘন্টা ধরে ঘনীভূত এই বৃষ্টিপাত শিলিগুড়ির পর্যটন শহর মিরিকের সাথে সংযোগকারী বালাসন নদীর উপর অবস্থিত দুধিয়া সেতুটি ধ্বংস করে দেয় এবং সমস্ত জাতীয় ও রাজ্য মহাসড়কে যান চলাচল ব্যাহত করে।

সাম্প্রতিক ঘটনা **তিন**— ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রাতভর বৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়ে কলকাতা শহর। শহরের অন্যতম সড়কগুলি জলের তলায় চলে যায়। দুর্গাপুজোর দিন কয়েক আগে ঘটে যাওয়া এমন বিপর্যয়ে দুর্ভোগে পড়ে সাধারণ মানুষ। মেট্রো ও রেল চলাচল ব্যাহত হয়। শহরের নীচু এলাকায় বাড়িঘর এবং স্কুল জলমগ্ন হয়ে পড়ে। মোট ৮ জনের মৃত্যুর খবর সরকারিভাবে পাওয়া গেছে।

বিস্তারিত আলোচনার শুরুতে প্রথমেই আসা যাক Natural Disaster শব্দগুচ্ছের মানে কী?

সাধারণভাবে Natural Disaster বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে বোঝায় প্রকৃতি বা মানবসৃষ্ট যে কোনো দুর্যোগ—যা মানুষের জীবনের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করে। Wikipedia প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সংজ্ঞা দিচ্ছে, 'A natural disaster is the very harmful impact on a society or community brought by natural phenomenon or hazard'. একটি দুর্যোগ তুলনামূলকভাবে আকস্মিক হতে পারে,—যেমন ভূমিকম্প, অথবা এটি দীর্ঘ সময় ধরে হতে পারে, যেমন করোনার মতো মহামারি। আমাদের দেশে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে যথেষ্ট পরিমাণে দুর্যোগের ঝুঁকি রয়েছে। দেশের ৩৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ২৭ টিই দুর্যোগপ্রবণ। Wikipedia আবার দুর্যোগকে প্রকৃতিসৃষ্ট এবং মানবসৃষ্ট— এই দুই ভাগে ভাগ করছে।

প্রকৃতিসৃষ্ট দুর্যোগ কী? যেমন—ঘূর্ণিঝড়, খরা অথবা সুনামি তাপপ্রবাহ, ভূমিকম্প, মেঘভাঙা বৃষ্টির মতো বিপর্যয়, যাতে মানুষের অবদান থাকে খুবই কম।

প্রকৃতিসৃষ্ট দুর্যোগের পাশাপাশি আছে Wikipedia-র সংজ্ঞায় 'মানব সৃষ্ট' দুর্যোগ। মানব-সৃষ্ট কারণগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকূল প্রভাবকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন, শিল্পায়ন এবং নগরায়নের মতো মানব-সৃষ্ট কারণগুলি চরম আবহাওয়ায়জনিত ঘটনার ফ্রিকোয়েন্সি এবং তীব্রতা বৃদ্ধি করে, যার ফলে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

ভারতে এই বিপুল পরিমাণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভৌগোলিক কারণ কী?

১) টেকটোনিক প্লেট: হিমালয় অঞ্চল এবং তার সংলগ্ন ভূ-টেকটোনিক প্লেটগুলির ক্রমাগত সংঘর্ষ এই অঞ্চলটিকে ভূমিকম্প, ভূমিধস, মাটির ক্ষয়, তুষারধস ইত্যাদির জন্য সংবেদনশীল করে তোলে।

২) দেশের অবস্থান: ভারত গ্রীষ্মমন্ডলীয় জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় ঘূর্ণিঝড় এবং দাবানলের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি অনেক বেশি।

৩) বৃষ্টিপাতের ধরণ: ভারত মূলত মৌসুমি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। ভারতে বৃষ্টিপাতের ধরণ সবজায়গায় একইরকম নয়। আসাম এবং বিহারের মতো কিছু জায়গায় যেমন বন্যার প্রবণতা দেখা যায়, অন্যদিকে দেশের পশ্চিমাঞ্চল, রাজস্থান, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে ঘন ঘন খরা দেখা দেয়।

৪) পরিকাঠামোর অভাব: পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও পরিষেবার অভাব, অনিরাপদ আবাসন এবং অপর্যাপ্ত ও দুর্বল স্বাস্থ্যসেবা Natural Phenomenon কে দুর্যোগে পরিণত করতে পারে।

৫) দুর্বল নগর পরিকল্পনা: দুর্বল নগর পরিকল্পনা, অপর্যাপ্ত নিষ্কাশন পরিকাঠামো এবং দ্রুত অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির কারণে ভারতের শহরগুলিতে বন্যার ঝুঁকি দেখা দিয়েছে।

৬) বনভূমির অবক্ষয়: একরের পর একর বনভূমি উজাড়ের ফলে ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় হয়, যা পরবর্তীতে দ্রুত ভূমিধসের মতো ঘটনা নিয়ে আসে।

৬) জলবায়ু পরিবর্তন: আকস্মিক জলবায়ু পরিবর্তন বা Global Warming ভারত সহ বিশ্বজুড়ে দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলেছে। যেহেতু উষ্ণ বাতাস বেশি জল ধরে রাখতে পারে, তাই কিছু অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত এবং চরম বন্যার সৃষ্টি হয়। জলবায়ু পরিবর্তন সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে, যা গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের গঠন এবং আচরণকে অনেকটাই প্রভাবিত করে, এবং যার ফলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

তবে ভূতাত্ত্বিকদের মত হল, কেবলমাত্র ভৌগোলিক কারণেই ভারতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে না। এর সাথে আছে মানুষের নানা কার্যকলাপ। প্রথমেই বলা যায়, গঙ্গাসহ অন্যান্য নদীর ধারে দ্রুত নগরায়ণ এবং অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে সাম্প্রতিক অতীতে শহরাঞ্চলগুলিতে বন্যার ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী ছিল ২০১৪ সালে শ্রীনগর এবং ২০১৫ সালে চেন্নাইয়ে ঘটে যাওয়া বন্যা। ২০২২ সালে জেনেভার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে ভারী বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ২০২২ সালে ভারতে প্রায় ২৫ লক্ষ Internal Migration বা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি হয়েছে। তবে কেবল ভারতে নয়, দক্ষিণ এশিয়ায় ২০২২ সালে দুর্যোগের কারণে ১ কোটি ২৫ লক্ষ অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ঘটেছে, যার মধ্যে ৯০ শতাংশই বন্যার কারণে হয়ে। সব দেশেই বন্যায় বাস্তুচ্যুতি রেকর্ড করা হয়েছে, তবে পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০২১ সালে ভারত ও বাংলাদেশে মৌসুমি বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই বন্যা শুরু হয়েছিল। ২০২২ সালে দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে ঝড়ের কারণে প্রায় ১.১ মিলিয়ন Internal Migration ঘটে। ২০২১ সালে গান্ধীনগরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির গবেষকদের এক প্রতিবেদন অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে ভারতে বন্যা এবং তাপপ্রবাহের মতো চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলির ফ্রিকোয়েন্সি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। গবেষণায় বলা হয়েছে যে Global Warming এবং এল নিনোর প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে বজ্রপাত এবং ভারী বৃষ্টিপাতের ঘটনা উল্লেখজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরে ঘূর্ণিঝড়গুলি দ্রুত তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের তীব্রতা ধরে রাখছে। ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক জারি করা ভারতের জলবায়ু সংক্রান্ত বার্ষিক বিবৃতি ২০২২ অনুসারে, ২০২২ সালে ভারতে চরম আবহাওয়ার ঘটনার কারণে ২,২২৭

জন মানুষের প্রাণহানি সরকারিভাবে রেকর্ড করা হয়েছে।

দেশে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি কতটা মানবসৃষ্ট?

ভূতাত্ত্বিক লুবাইনা রঙ্গওয়ালার মতে, ''বিশ্বজুড়ে আমরা এখন যে পরিমাণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখতে পাচ্ছি তা অবশ্য অনেকটাই মানবসৃষ্ট। জনসংখ্যার কিছু অংশ এর জন্য অন্যদের থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। আমাদের এমন ব্যবস্থা এবং সমাধান খুঁজে বের করতে হবে যা বিশেষভাবে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর দিকে পরিচালিত করা যেতে পারে। আমাদের আরও শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে এটি করতে হবে।'' তাঁর মতকে সমর্থন করে বিমল মিশ্র বলেন, ''জলবায়ু বিপর্যয়ের ঝুঁকি বৃদ্ধিতে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিপদের ফ্রিকোয়েন্সি এবং তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন এতে একটি প্রধান ভূমিকা হিসেবে দেখা দিয়েছে। আমরা প্লাবনভূমিতে অবৈধ নির্মাণ করছি, জলাশয় দখল করছি এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করেই আমাদের শহরগুলির পরিকল্পনা করছি। তাই, আজকের এই বিপর্যয়ের জন্য মানুষই দায়ী। পুরোপুরি নয়, তবে সমস্যা বৃদ্ধিতে আমরা যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছি। তবে আমাদের সমাধান খুঁজে বের করা উচিত এবং আমাদের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।''

এই সমস্ত ভূতাত্ত্বিকদের মতে নিম্নলিখিত মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ত্বরান্বিত করেঃ-

জলবায়ু পরিবর্তন: রেফ্রিজারেটর বা এসি-র মতো যন্ত্র অতিরিক্ত ব্যবহারে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের প্রাবল্য বিশ্বউষ্ণায়নকে ডেকে আনছে। তার ফলে বাড়ছে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা।

নগরায়ন এবং উন্নয়ন: নদীতীর এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মতো এলাকায় অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং নির্মাণকাজ বন্যা এবং ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়ায়, যেমনটি দিল্লি এবং যোশীমঠের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিতে দেখা গেছে।

পরিবেশগত অব্যবস্থাপনা: পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব, দুর্বল কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বন উজাড় করে জলপথ বন্ধ করে এবং প্রাকৃতিক তার সাথে জলপ্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে দুর্যোগকে আরও বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে।

দুর্বলতা: প্লাবনভূমিতে নির্মাণ, জলাশয় দখল এবং অনিরাপদ আবাসন নির্মাণের মতো বিষয়গুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

২০২১ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিশ্বব্যাপী ১০,০০০ এরও বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে অথবা নিখোঁজ হয়েছে। বিমা সংস্থা সুইস রে-এর মতে, মানবসৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণ, বিমান ও মহাকাশ বিপর্যয়, জাহাজ দুর্ঘটনা, রেল দুর্ঘটনা, খনির দুর্ঘটনা, ভবন অথবা সেতু ধসে পড়া এবং আরও বিভিন্ন কারণ (সন্ত্রাসবাদ সহ)। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প, দাবানল, তাপপ্রবাহ, শীতল তরঙ্গ, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি এবং সুনামির মতো ঘটনা। সুইস রে-এর হিসেব অনুযায়ী, এই দুর্যোগের ফলে বিশ্বব্যাপী ২৫৮.৮৬ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২৫০ বিলিয়ন ডলার ছিল কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে। বাকিটা ছিল মানবসৃষ্ট ঘটনার কারণে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে মাঝামাঝি সময়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বার্ষিক মৃত্যুর সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেশি ছিল, প্রায়শই দশ লক্ষ ছাড়িয়ে যেত। তবে, সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, মৃতের সংখ্যা উল্লেখজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে, প্রায় ২০,০০০-এরও কম। গত দশকে, এটি প্রায় ১০,০০০-এরও কম ছিল। তবে বিশ্বের দশটি দেশের মধ্যে ভারত অন্যতম, যেখানে দুর্যোগপ্রবণতা অনেকটাই বেশি।

সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্য এপিডেমিওলজি অফ ডিজাস্টারস (The Centre for Research on the

Epidemiology of Disasters) সংস্থার দেওয়া ইমার্জেন্সি ইভেন্টস ডাটাবেস অনুসারে, ভারত ১৯০০ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ২০৫টি ঝড় এবং ৩১৬টি বন্যার সম্মুখীন হয়েছে। ৩০ বছরে (১৯৯২-২০২২), বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে দুর্যোগের বার্ষিক গড় ছিল ৩৪৪টি, কিন্তু ২০২২ সালে মোট ঘটনার সংখ্যা বেড়ে ৩৮৯টিতে দাঁড়িয়েছে।

২০২৩ সালে ঘটা যোশীমঠ ভূমিক্ষয় অথবা দার্জিলিং-এ ঘটে যাওয়া বিপত্তির বেশ কিছু কারণ প্রকৃতিবিদরা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে বেশিরভাগটাই মনুষ্যসৃষ্ট। যেমন, অপরিকল্পিত নির্মাণ এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি এর পেছনে ভূমিকা রেখেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

পরিবেশবিদরা দার্জিলিং-এর ভূমিধসকে 'মানবসৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয়' (manmade natural disaster) হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা কয়েক দশক ধরে বন উজাড়, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং দুর্বল প্রশাসনের অনিবার্য পরিণতি, যা হিমালয়ের ভঙ্গুর ঢালগুলিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। পরিবেশবিদরা বলেন, বিকেন্দ্রীভূত দুর্যোগ পরিকল্পনা (Decentralised Disaster Manegment), নির্মাণ নীতিমালার কঠোর প্রয়োগ এবং জলবায়ু-সংবেদনশীল উন্নয়নের মাধ্যমেই এগিয়ে যাওয়ার পথ নিশ্চিত করা সম্ভব, যাতে 'পাহাড়ের রানী' বারবার দুর্যোগ অঞ্চলে পরিণত না হয়। দীর্ঘকাল ধরে ভ্রমণকারীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত মনোরম দার্জিলিং পাহাড় এখন প্রকৃতির ক্রোধের ক্ষত বহন করছে। বারো ঘন্টার অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে ভয়াবহ ভূমিধসে ২০ জনেরও বেশি মানুষ মারা যায় এবং বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। শান্ত ঢালগুলি ধ্বংসস্তূপ এবং হতাশার স্থানে পরিণত হয়েছে—এটি একটি ভয়াবহ সত্য যে প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রায়শই মানুষের অবহেলার পরে আসে। পরিবেশবিদ এবং বিশেষজ্ঞরা যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এই ধরণের বিপর্যয়ের বিষয়ে সতর্ক করে আসছেন, তাঁরা বলছেন যে এটি কোনও অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় নয়, বরং বছরের পর বছর ধরে পরিবেশগত শোষণ এবং প্রশাসনিক উদাসীনতার ফলাফল।

উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞান কেন্দ্রের সদস্য পরিবেশবিদ সুজিত রাহা বলেন, 'পাহাড়গুলি কয়েক দশকের অবহেলার জন্য ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে—বন উজাড়, অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট এবং বেপরোয়া নির্মাণ ভূখণ্ডকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। বৃষ্টিপাতই কেবলমাত্র এই ধ্বংসের কারণ নয়, আসল কারণ হল আমরা পাহাড়ের সাথে কীভাবে আচরণ করেছি', এই ধরনের সংকট মোকাবিলার জন্য কোনও সঠিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অথবা পরিকল্পনা নেই। প্রশাসন এবং কর্তৃপক্ষকে এই সমস্যাটিকে গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে এবং এটিকে শুধুমাত্র একটি ট্র্যাজেডি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। তিনি আরও বলেন, অনিয়ন্ত্রিত নগর বৃদ্ধি, দুর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং নির্মাণের জন্য পাহাড় কাটা দার্জিলিংয়ের বাস্তুতন্ত্রকে অকল্পনীয়ভাবে পরিবর্তিত করে দিয়েছে।

কলকাতার সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেনের অধ্যাপক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ শৈলেন্দ্র মণি প্রধান বলেছেন, দেশের সবচেয়ে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলগুলির মধ্যে একটিতে অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের সরাসরি পরিণতি হল ভূমিধস। 'দার্জিলিং একটি উচ্চ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত এবং স্বাভাবিকভাবেই ভূমিধসের ঝুঁকি রয়েছে। তবুও, পর্যটন এবং আবাসনের জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কোনও আইন বা নিষ্কাশনের নিয়ম ছাড়াই হয়ে চলেছে'। তিনি উল্লেখ করেন যে, অস্থির ঢালে, বিশেষ করে মিরিক, কার্শিয়ং, কালিম্পং এবং দার্জিলিং শহরে, বহুতল ভবনের অবাধ নির্মাণ ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নির্মাণ বিধি লঙ্ঘনের পরিবেশগত ঝুঁকি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। দার্জিলিং পৌরসভার প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ জমি আবাসিক উদ্দেশে বরাদ্দ করা হয়েছে, যা টেঁকসই নয়।

পরিবেশ পণ্ডিত বিমল খাওয়াস বলেন, এই ট্র্যাজেডিটি কয়েক দশক ধরে এই অঞ্চলকে তাড়িত করে আসা চরম জলবায়ুগত ঘটনার পুনরাবৃত্তিমূলক প্যাটার্নের সাথে খাপ খায়, 'আমরা এখন যা দেখছি তা নতুন নয়, তবে এবারের ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রা প্রাকৃতিক দুর্বলতা এবং ভঙ্গুর হিমালয় বাস্তুতন্ত্রের উপর ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপ, উভয়কেই প্রতিফলিত করে'।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞ সত্যদীপ ছেত্রী সতর্ক করে বলেছেন যে পূর্ব হিমালয় 'জলবায়ু পরিবর্তন থেকে জলবায়ু সংকটের' (From Cimate change to Climate crisis) পর্যায়ে চলে গেছে। তিনি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল থেকে বসতি স্থানান্তর এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসনের আহ্বান জানিয়েছেন।

ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবে বন্যা, তার সাথে মেঘ ভাঙন এবং ভূমিধস এক অতি সাধারণ ঘটনা। স্থানীয়দের মতে, তারা ভূমিধস এবং পুনরুদ্ধারের এক পরিচিত চক্রের মধ্য দিয়ে বাস করছেন। হিমাচলের চাম্বা জেলায়, যেখানে মণিমহেশ যাত্রা চলছিল, সেখানে ভরমৌর হাইওয়ে ভেঙে পড়ার পর ৫,০০০ এরও বেশি তীর্থযাত্রী আটকা পড়েছিলেন। ট্যুর কোম্পানি গো হিমাচলের সিইও সিদ্ধার্থ বাকারিয়ার মতে, বন উজাড় এবং পরবর্তীকালে মাটি ক্ষয়ের ফলে ভবনের ভিত্তি দুর্বল এবং অস্থির হয়ে পড়েছে, যার ফলে প্রতিটি বৃষ্টির সাথে সাথে ভবনগুলি ভেসে যাচ্ছে।

এই বিঘ্নগুলি কেবল এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। হিমালয় অঞ্চলটি একটি প্রধান পর্যটন কেন্দ্র যা সারা বছর ধরে ছুটি কাটাতে আসা পর্বতারোহী, ভ্রমণকারীদের এবং মৌসুমি যাত্রার সময় তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করে। বেশিরভাগ দর্শনার্থী সড়কপথে আসেন, মহাসড়ক এবং সেতু ভেঙে পড়ার ফলে হাজার হাজার মানুষ আটকা পড়ে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের উপর আরও চাপ সৃষ্টি হয়। হিমাচল প্রদেশে এই মরশুমে ৯১টি আকস্মিক বন্যা, ৪৫টি মেঘ ভাঙন এবং ৯৫টিরও বেশি ভূমিধসের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল উভয়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবস্থা ঘোষণা করেছে, বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াতে অনুরোধ করা হয়েছে।

কিন্তু স্থানীয়দের কথায় স্পষ্ট যে কেবল প্রকৃতির কারণে ভূমিধস হচ্ছে না। মেঘ ভাঙা এবং ভূমিধস প্রাকৃতিক ঘটনা, কিন্তু মানুষের কার্যকলাপ এবং উন্নয়নের ফলে এগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এখানে তিনটি বিষয় স্পষ্ট। প্রথমত, নদীর তীর এবং প্লাবনভূমিতে সরাসরি মহাসড়ক এবং বাণিজ্যিক কাঠামো নির্মাণের অর্থ হল নদীর জল উপচে পড়লে এই অঞ্চলগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহ্যবাহী কাঠ-কুনির পরিবর্তে সরু উপত্যকায় কংক্রিট-ভারী নির্মাণ স্থানীয় তাপমাত্রা বাড়ায় এবং মেঘের বিস্ফোরণকে তীব্র করে তোলে। তৃতীয়ত, টানেল এবং রাস্তা তৈরির জন্য বিস্ফোরণ অভ্যন্তরীণ শিলা গঠনকে ভেঙে দেয়, যার ফলে পাহাড়গুলি অস্থিতিশীল হয় এবং তুলনামূলকভাবে সাধারণ বৃষ্টিপাতের সময়ও ভূমিধসের ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চাভিলাষী 'চারধাম মহামার্গ বিকাশ' প্রকল্পের জন্য জাতীয় সড়কগুলি প্রশস্ত করার কাজে চারধাম রুট জুড়ে নির্মাণ এবং পাহাড় কাটার কার্যকলাপে পরিবেশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে। তীর্থযাত্রীদের এই রাস্তাটি সমভূমির হরিদ্বার-ঋষিকেশ থেকে গাড়োয়াল বিভাগের প্রত্যন্ত উচ্চভূমিতে অবস্থিত বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রী পর্যন্ত বিস্তৃত। পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এবং ভূতাত্ত্বিকভাবে ভঙ্গুর এই পাহাড়ি অঞ্চলে ভারী যন্ত্রপাতি দ্বারা ব্যাপক খনন এবং পাথর কাটার ফলে কম্পন তৈরি হয়, যা এর সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করতে পারে এবং ভূমিধসের ঘটনা ঘটাতে পারে। পাহাড়ে মৌসুমি বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার সাথে সাথেই, উত্তরাখন্ডের বিভিন্ন স্থানে ভয়ঙ্কর ভূমিধস, মেঘ ভাঙন এবং আকস্মিক বন্যা শুরু হয়েছে, যার মধ্যে ১,৬০৭ কিলোমিটার দীর্ঘ

চারধাম যাত্রা রুটও রয়েছে। জুলাই মাস নাগাদ হঠাৎ মেঘ ভাঙনের ফলে কেদারনাথ অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে।

হেমন্ত গাইরোলার (Hemant Gairola)-এর মতো পরিবেশবাদী কর্মী, যিনি আগে Centre for Science and Enviroment (CSR) এর সাথে যুক্ত ছিলেন, মনে করেন যে সমভূমিতে ঋষিকেশ এবং চারধাম রুটের উঁচুতে কর্ণপ্রয়াগকে সংযুক্ত করার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং একই সাথে রেলপথ সংযোগের মতো আরও কিছু প্রকল্প এই অঞ্চলের এই ভঙ্গুর পাথরের স্থায়িত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিচ্ছে। সব থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয় হল এই ভঙ্গুর হিমালয় পর্বতমালার দুর্বলতা, যা একবার বিঘ্নিত হলে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না। এই ব্যাপক নির্মাণ কার্যকলাপের ফলে একবার ভূতাত্ত্বিকগত বিঘ্ন শুরু হলে, ভবিষ্যতে দীর্ঘ সময় ধরে এর গুরুতর পরিণতি হবে, গাইরোলা মনে করেন। তবে, পরিবেশবিদদের সাবধানবাণীকে আগ্রাহ্য করে প্রশাসন তথা সরকার যেন একেবারে নিশ্চিত যে প্রকল্পগুলি কোনও পরিবেশগত বিঘ্ন ছাড়াই তাদের সংযোগের চূড়ান্ত ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে।

ভূতাত্ত্বিক কারণগুলি ছাড়াও, এই অঞ্চলে আরেকটি গুরুতর উদ্বেগের কারণ হল চারধাম যাত্রা সার্কিট বরাবর লাগামহীন, অপরিকল্পিত, ব্যাপক বাণিজ্যিক নির্মাণ এবং নগরায়ন, যার ফলে সারা ভারত থেকে তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের প্রচুর আগমন ঘটে।

পর্যটন সংস্থা গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের (Garwal Mandal Vikas Nigam) একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশান্ত নেগির মতে উত্তরাখন্ড ও হিমাচল প্রদেশে এখন পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় চারধাম সার্কিটের সৌজন্যে অভূতপূর্ব বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় যখন ভারী বর্ষণের ফলে দীর্ঘ পথের বিভিন্ন স্থানে ভূমিধস এবং রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, যেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত তীর্থযাত্রীরা বেশ কয়েক দিন ধরে কঠিন পরিস্থিতিতে আটকা পড়েন। 'জিএমভিএন-এ (GMVN) আমার কর্মজীবনে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তীর্থযাত্রা কখনও নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করতে হয়নি। কিন্তু এখন এই মরসুমে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে', নেগি উল্লেখ করেন।

দেরাদুন-ভিত্তিক গবেষক এবং ইতিহাসবিদ যোগেশ ধসমানা (Yogesh Dhasmana) উল্লেখ করেছেন যে সরকারী তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালের মে মাস থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ৩৫ লক্ষ তীর্থযাত্রী এবং পর্যটক চারধামের চারটি পবিত্র মন্দির পরিদর্শন করেছেন। নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত থাকায় এই সংখ্যা গত বছরের ৫.৪ মিলিয়ন পর্যটকের রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। চারধাম যাত্রার পুরো রুটটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভূকম্পন অঞ্চলে অবস্থান করে, ধসমানা বলেন যে বর্ষাকালে মুষলধারে বৃষ্টিপাত পরিস্থিতিকে আরও বিপজ্জনক করে তোলে, কারণ ঘন ঘন আকস্মিক বন্যা, মেঘ ভাঙন এবং সমগ্র অঞ্চলে নদীগুলি উপচে পড়ার আশঙ্কা থাকে। ওয়েনাডের তুলনায়, চারধাম অঞ্চলে পর্যটকের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে যে এই অঞ্চলে যেকোনো দুর্যোগ আরও বেশি লোককে প্রভাবিত করবে। অতএব, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের বারবার পরামর্শ গুরুত্ব সহকারে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে, যাতে এই অঞ্চলে বড় ধরনের ভূমিকম্প, ভূমিধস এবং বন্যার সম্ভাবনার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য সংবেদনশীল হিমালয় অঞ্চলে উচ্চ প্রযুক্তির পূর্বাভাস ব্যবস্থা স্থাপন করা যায়।

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি হল ঢালে গাছ লাগানো, বিশেষ করে মাটির সাথে সংযুক্ত গাছ লাগানো, যা মাটির ক্ষয়রোধ এবং ভূমিধস রোধের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। তবুও,

কোনও ব্যাখ্যাতীত কারণে, ভারতের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (NDMA অথবা National Disaster Manegment Authority) মাটির ক্ষয় রোধ করার জন্য রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণকে পছন্দ করে।

আরেকটি কার্যকর পদক্ষেপ হল ভবন বা রাস্তা নির্মাণের সময় পাহাড়ের ঢাল কেটে ফেলা এড়ানো। তবুও সারা দেশে মহাসড়ক নির্মাণের জন্য নিয়মিত ঢালের পাদদেশ কেটে ফেলা হয়। ঢালের পাদদেশ কেটে রাস্তা নির্মানকারী সংস্থাগুলি খাড়া ঢাল দিয়ে কৃত্রিম উল্লম্ব উচ্চতা (Artificial horizontal structure) তৈরি করছে যার ফলে ভূমিধস হয়।

ঢালু অঞ্চলে জল জমে থাকা রাস্তার ধারের ড্রেনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুঃখের বিষয় হল, ভারতে রাস্তার ধারের ড্রেনেজ ব্যবস্থা একেবারেই সঠিক পদ্ধতি মেনে হয় না। হিমালয়ে ড্রেনগুলি প্রায়শই ধ্বংসস্তূপ (debris) এবং আরও উদ্বেগজনকভাবে প্লাস্টিক দিয়ে আটকে থাকে। ২০২০ সালের একটি প্রবন্ধে, ভারতীয় বন বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সত্য প্রকাশ নেগি উল্লেখ করেছেন যে প্লাস্টিক কীভাবে হিমালয়ের পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। প্লাস্টিক তাপ শোষণ করে, প্রাকৃতিক জলাশয়গুলিকে আটকে দেয় এবং বন্যার পাশাপাশি ভূমিধসের কারণ হয় যা রাস্তাঘাট এবং সম্পত্তির ক্ষতি করে, এবং যার ফলে মৃত্যু এড়ানো সম্ভব নয়।

কিন্তু সম্ভবত পাহাড়ি অঞ্চলে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল নদীর তলদেশে অনিয়ন্ত্রিত, বেপরোয়া এবং প্রায়শই অবৈধ বালি উত্তোলন। পাহাড়ি রাস্তাগুলিতে নদীর উপর অসংখ্য সেতু থাকে। বিপজ্জনক উত্তোলন আমাদের নাকের ডগায় বা আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, আমাদের সেতুগুলির নীচ দিয়ে চলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই ধরনের অবৈধ বালি তোলার ফলে বিপর্যয় ঘটে।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ ও তার সমাধানের জন্য মাধব গ্যাডগিলের নেতৃত্বে Western Ghats Ecological Expert Panel (WGEEP) বা গ্যাডগিল কমিশন (Gadgil Comission) বসানো হয়। ২০১১ সালের ৩১শ অগস্ট কমিশন তার রিপোর্ট জমা দেয়। গ্যাডগিল কমিশন সমগ্র পশ্চিমঘাটকে একটি পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা (eco sensitive area) হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে। রিপোর্টটি বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এই অজুহাতে কেরালা এবং গোয়া সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের ভয়াবহ প্রতিফলন হল পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার ভূমিধস এবং কাছাকাছি গ্রামগুলির বন্যা।

গ্যাডগিল কমিটির পর, কে. কস্তুরিরঙ্গনের সভাপতিত্বে একটি নতুন কমিটি গঠিত হয় (২০১২)। কিন্তু রাজ্য সরকারগুলি এটিও প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তারা মনে করে যে কস্তুরিরঙ্গন কমিটির রিপোর্ট (২০১৩) উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য ক্ষতিকর। তবে দু'টি কমিটিই মোটামুটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য নিম্নলিখিত কারনগুলি উল্লেখ করে-

১) বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্যপূর্ণ হটস্পট এই অঞ্চলে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলের জন্য কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি না থাকার কারণে, পাহাড়ি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যপটই বদলে গেছে। গ্যাডগিল কমিশনের সমসাময়িক বিচারপতি এমবি শাহ কমিশনকে দেশজুড়ে অবৈধ খনির তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাদের প্রতিবেদনে গোয়ার পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় ৩৫ কোটি টাকার লৌহ আকরিক খনির কেলেঙ্কারির কথা প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রতিবেদনে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়কেই এই কেলেঙ্কারির পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২) নিয়মাবলীর অস্তিত্ব না থাকার সুযোগ নিয়ে, পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় বিশাল বনভূমি কেটে বিলাসবহুল রিসর্ট এবং হোম স্টে, অ্যাডভেঞ্চার পার্ক, স্কাইওয়াক, বিশাল দোলনা ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলি অবৈধভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এটিও অবৈধ খনির চাপে ইতিমধ্যেই জর্জরিত পশ্চিমঘাট পর্বতমালার

দুর্দশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

৩) গ্যাডগিল কমিশনের মতো অধ্যাপক বোরকারও মনে করেন যে 'খনি খাত এবং জলবাঁধ দ্বারা পর্বতশ্রেণীগুলিকে নির্মমভাবে আক্রমণ করা হয়েছে; এর সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় বনভূমি কৃষি ও রৈখিক অবকাঠামোর জন্য ক্ষয়প্রাপ্ত এবং একীভূত করা হয়েছে। এই নির্মল ভূদৃশ্য দখল এবং নগর পরিকল্পনার শিকার হচ্ছে'।

কলকাতা ও দিল্লির মতো মহানগরগুলিতে পরপর ঘটে চলা বন্যা বিপর্যয়ের কারণ কী? পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত কলকাতা বানভাসি হওয়া সম্পর্কে বলেন, 'কলকাতায় বেশিরভাগ পরিকল্পনাই স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি বিবেচনা না করেই তৈরি করা হয়। এখানে যা প্রয়োজন তা হল জলবায়ু কর্মকাণ্ড এবং আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের সাথে যুক্ত একটি স্থানীয়ভাবে পরিচালিত দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনা, বিশেষ করে জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে'। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রাজধানী শহরগুলিতে বন্যা রোধ করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন একটা ভালো Drainage System, যা ভারতের প্রায় সব রাজধানী শহরেই অভাব আছে। বৃষ্টিপাত অতিরিক্ত পরিমাণে হলেই ড্রেনেজ সিস্টেম একেবারেই ভেঙে পড়ে। তাহলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের মোকাবিলা কলকাতা এবং দিল্লি সহ রাজধানী শহরগুলিতে কীভাবে করা যেতে পারে? প্রথমেই, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধতা রোধ করার জন্য বর্ষা আসার আগে ড্রেনেজ ব্যবস্থা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, রাস্তাঘাট এবং পাবলিক স্পেস নিয়মিত পরিষ্কার করা, পাবলিককে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা জাগানো এবং আবর্জনা ফেলার জন্য জরিমানা আরোপ করা সহায়ক পদক্ষেপ হতে পারে। প্লাস্টিক সামগ্রীর উপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে আরোপ করা এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি।

তবে কলকাতা শহরে একটি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার ড্রেনেজ ব্যবস্থাও বর্ষাকালে বারবার জলাবদ্ধতার সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হবে কি না, এই ব্যাপারে সন্দেহ আছে। এর কারণ হল কলকাতা একটি বেশ প্রাচীন শহর এবং ড্রেনেজ নকশাও অনেক পুরোনো। অন্যদিকে দিল্লিতে ড্রেনেজ পরিকল্পনাটি ১৯৭৬ সালের, যা সেই সময়ে শহরের প্রায় ৩৫ লক্ষ জনসংখ্যার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ১০ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায়, ড্রেনেজ নকশার Re-modelling করা অত্যন্ত জরুরি। কলকাতার মতো ক্রমবর্ধমান শহরে নিয়মিত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং মৌসুমি বৃষ্টিপাতের জলের নিষ্কাশন ব্যবস্থা আদর্শভাবে পৃথক করা উচিত।

তৃতীয়ত, কেবলমাত্র উন্নত নিষ্কাশন ব্যবস্থাই Cloud burst মোকাবিলা করতে পারে না। জল শোষণ বৃদ্ধি, ভূপৃষ্ঠের জলপ্রবাহ কমানো এবং প্রবেশযোগ্য ফুটপাথ, সবুজ ছাদ এবং বৃষ্টির জল সংগ্রহের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জল পুনরায় পূরণ করা, একটি টেঁকসই নিষ্কাশন ব্যবস্থা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

চতুর্থত, বৃষ্টিপাতের সমস্যা মোকাবেলায় সবুজ এবং জলবায়ু-প্রতিক্রিয়াশীল পরিকাঠামোকে তৈরি করা নগর পরিকল্পনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। শহর জুড়ে সবুজ পাবলিক স্পেস, রাস্তার ধারে বাগান এবং বৃক্ষরোপণ হল এমন কিছু ব্যবস্থা যা অক্টোবর মাসে ঘটে যাওয়া মেঘ ভাঙার ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত জল শোষণ করতে পারে। তবে, বৃষ্টির সময় গাছ উপড়ে পড়ার মতো সমস্যা মোকাবিলায় পৌর সংস্থাগুলির জন্য সতর্ক থাকা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

শেষপর্যন্ত একথাই বলা যায় যে, প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা বজায় থাকবেই। মানুষের তার উপর কোনো হাত নেই। কিন্তু আমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে, মানুষের খামখেয়ালিপনা যেন নিজেদের বিপদ ডেকে না আনে। সরকার এবং জনগণ, উভয়কেই এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

আজ আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি যেখানে একদিকে প্রকৃতি, পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছিন্নতা অন্যদিকে পুঁজিবাদী কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সর্বগ্রাসী চেষ্টা এই যুগকে প্রকৃতপক্ষে Anthroposin না বলে Capitalopsin বলে চিহ্নিত করছে। নাম যাই হোক, আদতে আমাদের অস্তিত্বের সঙ্কট

আরও ঘনীভূত হচ্ছে। আজ পৃথিবীর চলমান দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবেশ বনাম পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব । এই দ্বন্দ্বে পুঁজিবাদের প্রতিরোধে মানুষ যত সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে ততই পুঁজিবাদ নিত্যনতুন ফিকির খুঁজে বার করছে, ফলতঃ লড়াই তীব্র হচ্ছে। সরকারকে কব্জা করে, পরিবেশ বাঁচানোর নামে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে তামাশা করছে তাতে, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, উন্নয়নশীল দেশের ওপর কৌশলে চাপ বাড়াচ্ছে পুঁজিবাদের পেটোয়া আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো। পরিবেশের সঙ্কট কাটাতে তাদের prescription বকলমে ধনীদের স্বার্থেই, সেখানে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হচ্ছে প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের পরম্পরা, চিরায়ত অভ্যাস, কৌশল। ইতিহাসকে অস্বীকার করা হচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী যে সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে আদান প্রদানের, বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে তাঁদের যাপনকে sustain করেছে। সারা পৃথিবীর কৃষি ব্যবস্থার ইতিহাস যা এখনও প্রান্তিক আদিবাসী, জনজাতি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে টিঁকে আছে তাকে দেখলে বোঝা যায় যে প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে কিভাবে নিবিড়ভাবে সম্পর্ক বজায় রাখা যায়। আজ মুনাফার জন্য পুঁজিবাদ এই সম্পর্কে নস্যাৎ করছে। তাই আজকের পরিবেশ সঙ্কট, প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর শুধু প্রাকৃতিক নয়, এক বহুমাত্রিক সঙ্কট। এক বৃহত্তর রাজনৈতিক অর্থনীতি এখানে জড়িয়ে রয়েছে। সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষের কাছে এই কথা পৌঁছে দেওয়াটা আজ তাই ভীষণভাবে দরকার। সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষের সচেতনতাই হবে পরিবেশের সমস্যাকে মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রাধিকারের মূলস্রোতে যুক্ত করার সম্বল। নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মের অস্তিত্ব যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তবে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে গঠনমূলকভাবে সুস্থায়ী করতে পুঁজিবাদের ফন্দিফিকিরের প্রতিরোধে গণআন্দোলনের প্রত্যয়কে সুদৃঢ় করতে হবে। নিঃসন্দেহে কঠিন চ্যালেঞ্জ তবে ধীরে হলেও মানুষ বুঝতে পারছে। যত দ্রুত এই বোধেরবিকাশ ঘটবে তত দ্রুত কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া যাবে।

তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া, দ্য হিন্দু

With Best
Compliments from :

A
Well
Wisher

ক্রোড়পত্র

শতবর্ষী ‘রক্তকরবী’ ও ‘RED OLEANDERS’

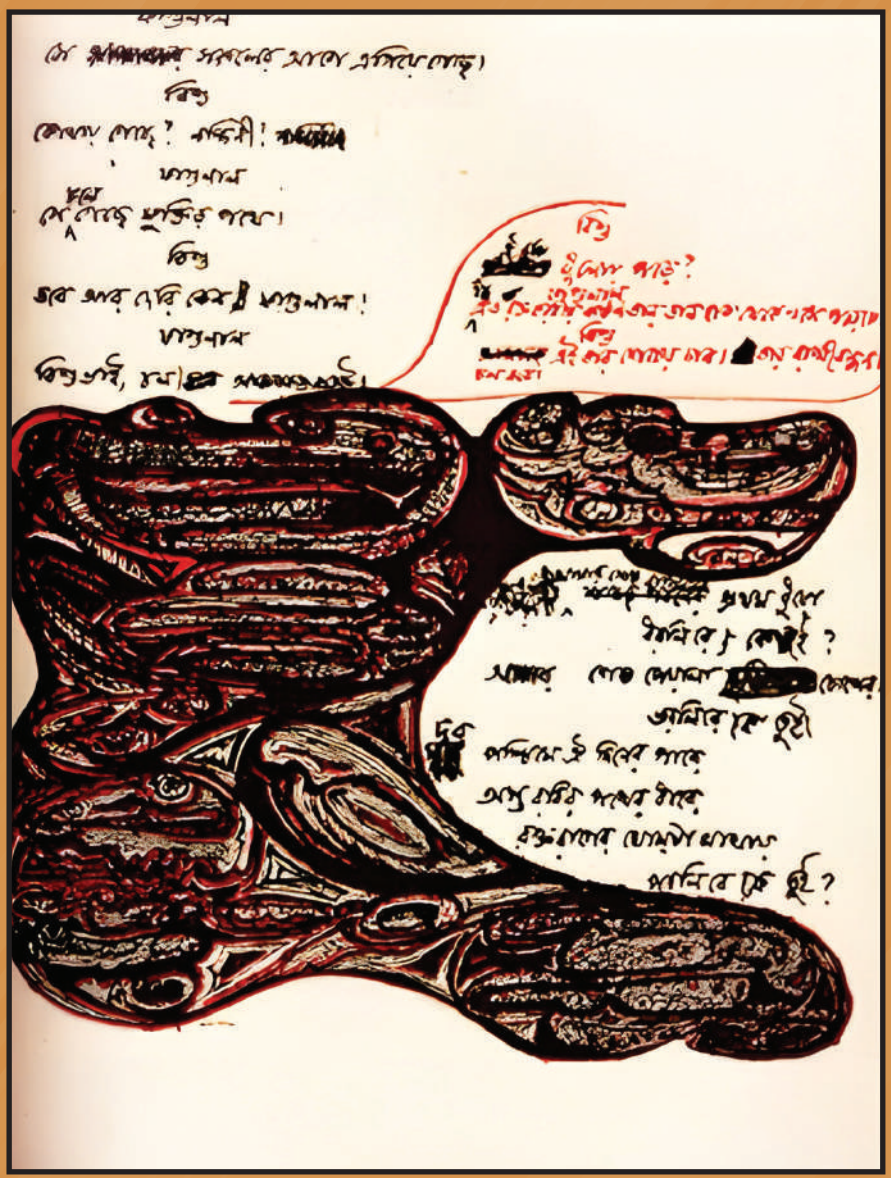

রক্তকরবী পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

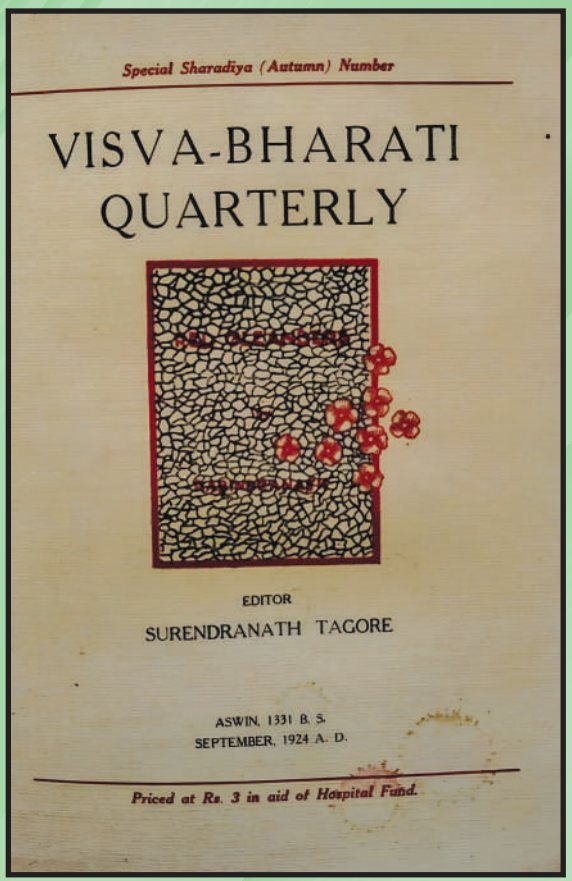

বিশ্বভারতী কোয়ারটার্লি -র ক্রোড়পত্র:
RED OLEANDERS

শতবর্ষী ‘রক্তকরবী’ ও ‘Red Oleanders’

‘রক্তকরবী’ : ফুটে ওঠার বৃত্তান্ত

১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশে রবীন্দ্রনাথ বিশ্রামের জন্য শিলঙ যাত্রা করেন। তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন দৌহিত্রী নন্দিতা, রাণু অধিকারী, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, পালিতা পৌত্রী নন্দিনী (পুপে) প্রমুখ। শিলঙ বাসকালে ১১ই মে এক চিঠিতে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখছেন—‘তুমি এবার শিলঙে এলে খুসি হতুম। আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হয়েচে। বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের জন্যে প্যারাগ্রাফ আকারে একটা লেখা শেষ করেচি। একটা নাটক গোচের কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে।’ ‘রবিজীবনী’কার প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন—‘নাটক’ গোচের লেখাটি হল ‘রক্তকরবী’ নাটকের প্রথম খসড়া। নাটকের মূল বক্তব্যটি বীজের আকারে দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের মনে গড়ে উঠছিল। ১৯২০-২১ নিউইয়র্ক থেকে তিনি ‘Flowing oil well, shreveport, La-II’ পিকচার-পোস্টকার্ডটি দিনেন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে লিখেছিলেন:

‘জিৎভূমি’, শিলং; এই বাড়িতেই ‘রক্তকরবী’ রচনার সূত্রপাত

ছবিটা ভাল করে দেখ্—কেরোসিনতেলের অন্ধকূপ-এর তলায় আছে তেল আর মাথায় উঠছে ধোঁয়া। এখানকার লক্ষেশ্বরদের এই দশা—এরা নিজের ধোঁয়ার মধ্যে নিজে বিলুপ্ত, সূর্যের আলো এদের মানসচক্ষে পৌঁছয় না। বলি রাজা পাতালপুরীর রাজা—তার বল হরণ করেছিলেন বামন অবতার। বিষ্ণু ছোট হয়ে বড়কে অভিভূত করেন। সময় এসেচে। যারা এতকাল ছোট হয়ে ছিল, তারাই বড়র ধন হরণকরার জন্যে হাত বাড়িয়ে—বড় ভয়ে কম্পান্বিত, চারদিকে দুর্গপ্রাচীর শক্ত করে গেঁথে তুল্‌ছে—কিন্তু দৈত্যভায়ার পাপের ধন আর টিঁকবে না।”

14 Jan 1921 তিনি অ্যান্ডরুজকে লেখেন: *‘To me, humainity is rich and large and many sided. Therefore, I feel deeply hurt when I find that, for some material gain, man’s personality is mutilated in the western world and he is reduced to a machine. The same process of repression and curtailment of humanity is often advocated in our country under the name of patriotism.’* অন্যত্রও রবীন্দ্রনাথের নানা লেখায় এই ধরনের মনোভাবের পরিচয় প্রকীর্ণ হয়ে রয়েছে, যা ‘রক্তকরবী’র মনোবীজ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

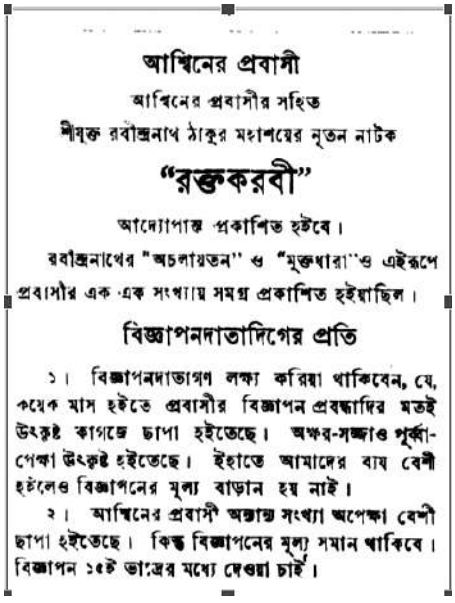

আশ্বিনের প্রবাসী

আশ্বিনের প্রবাসীর সহিত

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নূতন নাটক

“রক্তকরবী”

আদ্যোপান্ত প্রকাশিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের "অচলায়তন" ও "মুক্তধারা"ও এইরূপে প্রবাসীর এক এক সংখ্যায় সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি

১। বিজ্ঞাপনদাতাগণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে, কয়েক মাস হইতে প্রবাসীর বিজ্ঞাপন প্রবন্ধাদির মতই উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা হইতেছে। অক্ষর-সজ্জাও পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে আমাদের ব্যয় বেশী হইলেও বিজ্ঞাপনের মূল্য বাড়ান হয় নাই।

২। আশ্বিনের প্রবাসী অন্যান্য সংখ্যা অপেক্ষা বেশী ছাপা হইতেছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের মূল্য সমান থাকিবে। বিজ্ঞাপন ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে দেওয়া চাই।

‘রবিজীবনী’কার অনুমান করছেন, ‘রক্তকরবী’-র প্রথম নামহীন খসড়াটি লেখা শুরু হয়েছিল অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত চিঠির অব্যবহিত পরে অর্থাৎ May 1923-এর মাঝামাঝি বা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০-এর প্রথম দিকে। ‘রক্তকরবী’ গ্রন্থাকারে প্রথম

প্রকাশিত হয় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬) বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার অনেক আগে সম্পূর্ণ নাটকটি 'ক্রোড়পত্র' আকারে মুদ্রিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৩১); বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বাংলা নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগেই 'Red Oleanders' নামে নাটকটির অনুবাদ প্রথমে পত্রিকায় (Visva-Bharati Quarterly, Vol. II No. II, 1924) এবং পরে গ্রন্থাকারে (১৯২৫) মুদ্রিত হয়ে যায়।

প্রথম রচনাপ্রয়াস থেকে শুরু করে 'প্রবাসী' পত্রিকায় মুদ্রণকাল পর্যন্ত নাটকটির পাঠ পরিবর্তন ঘটেছে অন্ততঃ দশবার। 'রক্তকরবী'-র দশটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়, পরম্পরা হিসেবে তার চতুর্থ খসড়াটি ছাড়া অন্যগুলি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। চতুর্থ খসড়াটি কোনো ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে মুদ্রিত হয় বহুরূপী-নাট্যদলের মুখপত্র 'বহুরূপী' পত্রিকায় (মে ১৯৮৬)। চতুর্থ খসড়াটি ছাড়া অন্যসবকটি খসড়াকে একত্র করে নিয়ে 'রক্তকরবী'র একটি পাণ্ডুলিপি-সংবলিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় শ্রী প্রণয়কুমার কুণ্ডুর সম্পাদনায় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে শ্রাবণ, ১৪০৫-এ (১৯৯৮)।

'রক্তকরবী'র পর্যায়ক্রমে বিবর্তিত পাঠ ও বিকাশলাভের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে প্রণয়কুমার কুণ্ডু জানাচ্ছেন—'এখন, পাণ্ডুলিপি-বিবর্তনের চিত্রটি সামনে রেখে পারস্পরিক তুলনায় খসড়াগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আগেই বলেছি, অনেকটা 'কবির দীক্ষা' অথবা 'ফাল্গুনী'র সূচনার মতো প্রথম খসড়াটি নিছক সংলাপ-সর্বস্ব, বলা যায় তা 'রক্তকরবী'র ভ্রূণ রূপ। তার মধ্যে নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রেরমৌল আদল ও সংলাপের মূল কাঠামোটি বিবৃত থাকলেও বস্তুত তার ভিতর দিয়ে নাটকীয় রূপটি পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় খসড়ায় পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকীয় রূপটি তুলে ধরেছেন উপযুক্ত আঙ্গিকে। এই খসড়াটির সূচনায় রয়েছে নাট্যপরিচয়, যার ভিতর দিয়ে কবি নাটকটির বিষয়বস্তু ও ভাবগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ এই স্তর থেকেই নাটকটি যথার্থ রূপ নিয়েছে। তৃতীয় খসড়াটি এরই অনুগামী। এই স্তরে কবির মনে যক্ষপুরীর ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং এই খসড়া দুটির আবহ সেইভাবেই রচিত। পরবর্তী চতুর্থ এবং পঞ্চম খসড়াটির নাম দেওয়া হয়েছে 'নন্দিনী'। ...অর্থাৎ কবির দৃষ্টি পড়েছে নন্দিনীর চরিত্রের উপর। ফলে নন্দিনী চরিত্রটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সমগ্র নাটকের মধ্যে চরিত্রটির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চতুর্থ খসড়া থেকে সপ্তম খসড়া পর্যন্ত শব্দগত পাঠান্তর ছাড়া অন্য কোনো পরিবর্তন চোখে পড়েনা। এই অর্থে এই স্তরটিকে 'নন্দিনী'র স্তর বলা যেতে পারে। অতঃপর অষ্টম খসড়ায় রবীন্দ্রনাথ সরাসরি নাটকটির নাম রেখেছেন 'রক্তকরবী' এবং পরবর্তী নবম ও দশম খসড়া বহুলাংশে তারই অনুসারী। বস্তুত, সর্বশেষ এই স্তরটিই নাটকটির চতুর্থ বা রক্তকরবী স্তর। বিভিন্ন খসড়ার ভিতর দিয়ে নাটকটি শেষ পর্যন্ত এই অষ্টম খসড়ায় পৌঁছে একটি স্থিতিশীল রূপ পেয়েছে, বিশেষত সমাপ্তির দিক থেকে। নাটকটি কীভাবে সমাপ্ত হবে, পূর্ববর্তী খসড়াগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায়, সে বিষয়ে কবির মন যে ক্ষণে ক্ষণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে, তাতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। এই অষ্টম খসড়ায় এসে কবি সেই দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছেন এবং তার ফলে সুনিশ্চিতভাবে নাটকটির সমাপ্তিসূচক পরিকল্পনাটি করতে পেরেছেন। তবু নাটকটির পূর্ণায়ত রূপটি পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হয় দশম খসড়া পর্যন্ত যেখানে অকস্মাৎ নবাগত চরিত্র কিশোরকে পাই। 'রক্তকরবী'র গোড়াতেই কিশোরকে এনে কবি রক্তকরবীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং সেই সূত্রে রক্তকরবীর তাৎপর্যও সুকৌশলে

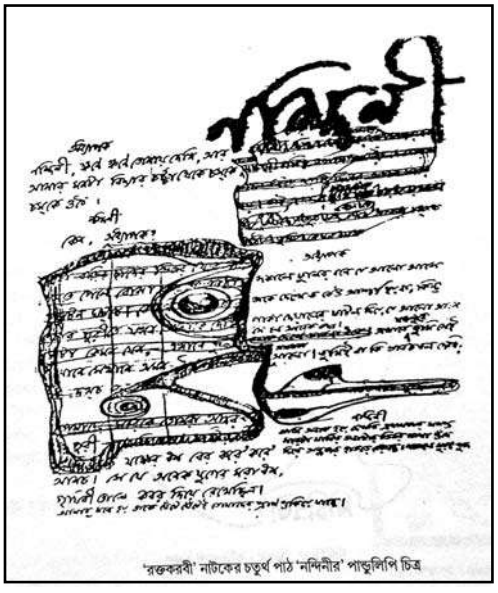

'রক্তকরবী' নাটকের চতুর্থ পাঠ 'নন্দিনীর' পাণ্ডুলিপি চিত্র

নাটকের শরীরে বিধৃত করেছেন যা পূর্ববর্তী খসড়াগুলির মধ্যে ছিল না। প্রতিমা গড়তে গিয়ে পটুয়া যেমন শেষ তুলির টানে মূর্তিটিকে জীবন্ত করে তোলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি চকিত আশ্চর্য স্পর্শে এই চরিত্রটিকে এনে নাটকটিকে পূর্ণতা দিয়েছেন। এইভাবে 'রক্তকরবী' চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে।'

এই সূত্রেই উল্লেখ করা যেতে পারে—নন্দিনীর নাম প্রথম পাঠে ছিল খঞ্জনী বা খঞ্জন। দ্বিতীয় খসড়াতেও এই নাম পাওয়া যায়, কিন্তু সেইখানেই 'খঞ্জনী'কেটে নন্দিনী করা হয়েছে। অল্প সময়ের জন্য দ্বিতীয় পাঠে আরো একটি নাম তৈরি হয়েছিল 'সুনন্দা'। দ্বিতীয় কথা নাটকের প্রথম পাঠে রক্তকরবী-ফুলটির আবির্ভাব হয়নি। দ্বিতীয় পাঠে ফুলটির কথা এসেছে, তবে মাত্র দুবার। ফুলটি গুরুত্ব পেতে থাকে অনেক পরবর্তী পাঠে।

যক্ষপুরী থেকে নন্দিনী হয়ে রক্তকরবীতে পৌঁছবার প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীকে লেখা ক্ষিতিমোহন সেনের এই পত্রাংশটি স্মরণযোগ্য:

"মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে একটি কথা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন—দেখুন, প্রাণের জন্য ভয় নাই। উপনিষদ বলেন, প্রাণই সত্য, তার মৃত্যু নেই, ভয় জড়ের জন্য। বিজ্ঞান বলছেন, প্রকৃতির হাতে রচিত যে বস্তু তারও মৃত্যু নেই। মরে যতসব মানুষের রচা কৃত্রিম অসত্য বস্তু। রক্তকরবীতে আমি সেকথা বলেছি। হাজার বাঁধনে বেঁধেও, শত চাপা দিয়েও প্রাণকে কবে মারতে পেরেছে? আমার ঘরের কাছে একটি লোহালক্কড় জাতীয় আবর্জনার স্তূপ ছিল। তার নীচে একটা ছোট্ট করবী গাছ চাপা পড়েছিল। ওটা চাপা দেবার সময় দেখতে পাইনি, পরে লোহাগুলি সরিয়ে আর চারাটুকুর খোঁজ পাওয়া গেল না। কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন দেখি ঐ লোহার জাল-জঞ্জাল ভেদ করে একটি সুকুমার করবী শাখা উঠেছে একটি লাল ফুল বুকে করে। নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তার বুকের রক্ত দেখিয়ে সে মধুর হেসে প্রীতির সম্ভাষণ জানাতে এলো। সে বললে, ভাই মরি নি তো, আমাকে মারতে পারলে কই? তখন আমার মনের মধ্যে এই বিষয়ের প্রকাশ বেদনা দিল। নাটকটাকে তাই 'যক্ষপুরী', 'নন্দিনী' প্রভৃতি বলে আমার তৃপ্তি হয়নি, তাই নাম দিলাম 'রক্তকরবী'।" (সূত্র: রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ-প্রমথনাথ বিশী)

আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য আমরা পাচ্ছি এই নাটকের গড়ে ওঠার পর্বে আমেরিকার সোশ্যালিস্ট ঔপন্যাসিক Upton Sinclare (১৮৭৮-১৯৬৮)কে ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩-এ লেখা কবির একটি চিঠিতে। সিনক্লেয়ারের কাছ থেকে কিছু বই উপহার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন, সিনক্লেয়ারের The Brass Check (১৯১৯) তিনি পড়েছেন এবং তাঁর অভিমত—'Your fearless stand for truth, for the things that are right, your viewpoint of the humiliation that worship of money brings, its stifling quality, its empty arrogance, its insdious undermining of self-respect, its valuelessness, all the attributes which are its curse when dollars own the man; these ideas which you inculcated in this particular book immediately made a bond of sympathy. For Years, I have thought over these things, this especial phase our modern civilizaton and only a few weeks ago I have myself finished a drama on the same subject. It will be published shortly in English and I shall hope to have the pleasure of sending you a copy.'

প্রথম রচনাপ্রয়াস থেকে শুরু করে এক বছরের কিছু বেশি সময় ধরে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের খসড়া অদলবদল করেছিলেন। কবির মনোবাঞ্ছা ছিল অভিনয়ের পরে নাটক প্রকাশ করা, বস্তুতঃ তা আর হয়ে ওঠেনি। [দ্রঃ- এই ক্রোড়পত্রের 'রক্তকরবী' : মঞ্চায়নের ইতিবৃত্ত' শীর্ষক পরিচ্ছেদ] ১৩৩১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকার ক্রোড়পত্র হিসেবে 'রক্তকরবী'-র আত্মপ্রকাশ। আত্মপ্রকাশের সময় নাটকটির শেষে মুদ্রিত হয় কবির নিজের হাতে পাণ্ডুলিপি কাটাকুটির এক বিচিত্র নকশা। নকশাটি মুদ্রিত হয়েছিল টেলপিস হিসেবে। পাণ্ডুলিপি কাটাকুটির ওই নির্দশনটি ব্যতীত 'রক্তকরবী'-র অঙ্গে কোনো অলংকরণ ছিল না। 'প্রবাসী' ক্রোড়পত্রে

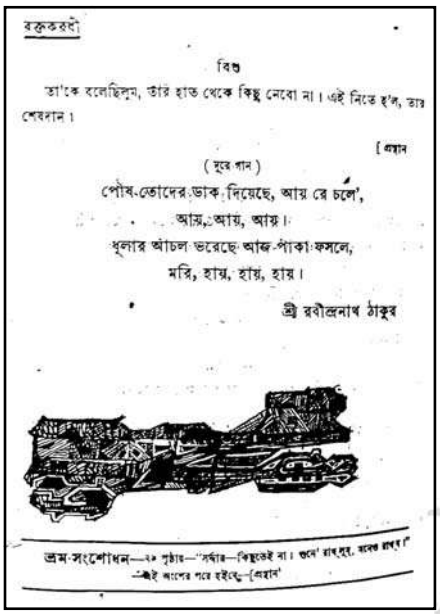

রক্তকরবী

বিশু

তা'কে বলেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেবো না। এই নিতে হ'ল, তার শেষদান।

[প্রস্থান

(সুরে গান)

পৌষ-তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে',
আয়, আয়, আয়।
ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায়, হায়, হায়।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভ্রম-সংশোধন—২০ পৃষ্ঠায়—"সর্দার—কিছুতেই না। শুনে' রাখ,খুব, ...
—এই অংশের পরে হইবে—[প্রস্থান'

প্রকাশিত 'রক্তকরবী'র প্রচ্ছদে ব্যবহার করা হয়েছিল 'যক্ষপুরীর রাজপ্রাসাদের জালাবরণ' নামক গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত একটি চিত্র। গগনেন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত জ্যামতিক রীতির এ চিত্রটি তাঁরই অঙ্কিত 'দ্বারকাপুরী'র অঙ্কনশৈলীর সহধর্মী।

বারংবার খসড়া সংশোধন শুধু নয়, তার পাশাপাশি নাটকটির অনুবাদের কাজও চলছিল; রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)-কে লেখা কবির চিঠি থেকে (৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩) এই সংবাদ পাওয়া যায়: 'বেনোয়াকে নিয়ে এখনো আমার নন্দিনীর তর্জমা করে চলেছি। কাল সকালে বোধহয় শেষ হয়ে যাবে।' সুইস-ফরাসি বহুভাষাবিদ বেনোয়া এসেছিলেন বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করার জন্য, তিনি অল্পবিস্তর বাংলাও শিখেছিলেন। দেখা যাচ্ছে ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'Visva-Bharati Quarterly' পত্রিকায় 'রক্তকরবী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ 'Red Oleanders' প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ পত্রিকার প্রকাশের দিক থেকে এই নাটকের বাংলা ও ইংরেজি চেহারা প্রায় একইসঙ্গে দেখা দেয় আশ্বিনের 'প্রবাসী' (১৩৩১ বঙ্গাব্দ) আর সেপ্টেম্বরের 'Visva-Bharati Quarterly' (১৯২৪)-তে। বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লিতে 'Red Oleanders' অলঙ্কৃত হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথের আঁকা বেশ কিছু ছবিতে আলোছায়ার নানা টুকরোকে জ্যামিতিক আকারের ছাঁদে সংলগ্ন করে, 'যক্ষপুরী'র অন্ধকারের চিত্রনাট্যকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ছবিগুলি

RED OLEANDERS

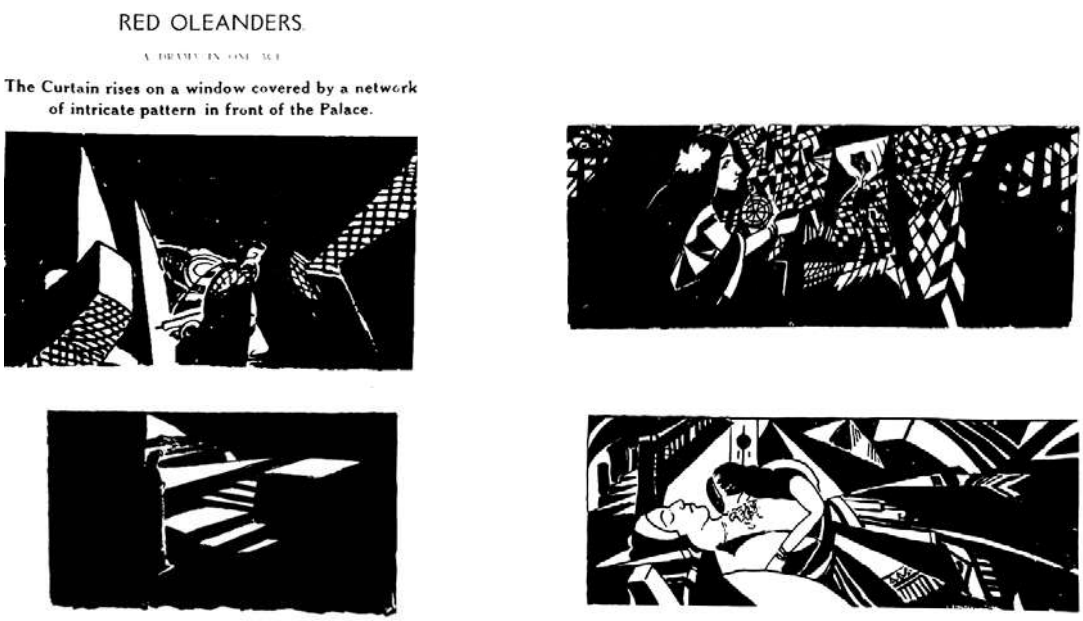

A DRAMA IN ONE ACT

The Curtain rises on a window covered by a network of intricate pattern in front of the Palace.

চিত্র : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক আলাদা মাত্রার সংযোজন করেছিল, সে-কথা বলাইবাহুল্য। আর্টপ্লেটে ছাপা একটি রঙীন ছবিও ছিল, যা 'আলো'র এই বিশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত হয়েছে।

বিলাতের ম্যাকমিলান প্রকাশনী থেকে গ্রন্থাকারে 'Red Oleanders' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে 'রক্তকরবী'-র গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। অর্থাৎ গ্রন্থাকারে 'Red Oleanders' 'রক্তকরবী'-র পূর্বগামী।

'রক্তকরবী' : মঞ্চায়নের ইতিবৃত্ত

'রবীন্দ্রজীবনী'কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—'কবির জীবদ্দশায় 'রক্তকরবী' কখনো অভিনীত হয় নাই।' এটি অবশ্য সঠিক তথ্য নয়, তবে নিজে অনেকবার চেষ্টা করেও রবীন্দ্রনাথ এর কোনো অভিনয় সংঘটিত করে তুলতে পারেননি, একথা সত্য। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ১৯৩৪-এ একবার মাত্র অভিনীত হয়েছিল এ নাটক, **'The Tagore Dramatic Group'** নামে একটি সংস্থা **'বিহার ভূকম্প পীড়িতের সাহায্যার্থে'** এই নাটকের একটি অভিনয় করে **৬ এপ্রিল, ১৯৩৪**-এ। সেই অভিনয় উপলক্ষে মুদ্রিত অভিনয়পত্রীতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি নাট্যপরিচয়ও ছিল, সেই লেখাটি কবি স্বয়ং পরিমার্জনা করেন, অবনীন্দ্রনাথ লিখিত উক্ত নাট্যপরিচয়টি ছিল এইরকম:

এই নাট্যব্যাপার চলেছে 'যক্ষপুরী'তে যেখানে মাটির তলায় কবর দেওয়া থাকে যক্ষের ধন, পাতালের কাছাকাছি একটা জায়গায়। যক্ষপুরের ভারবাহীর দল—মাটির তলাকার সোনা তোলার কাজে দিনরাত নিযুক্ত—খুঁড়ে তুলছে মাটি, কেটে চলেছে সুড়ঙ্গ, বহে আনছে কত কত সোনা তাল তাল অবিরাম। এখানকার 'মালিক' যে, সে আছে অষ্টপ্রহর, অসংখ্য মানুষের সুখদুঃখ থেকে দূরে, একটা অত্যন্ত জটিল জালের আবরণে ভীষণ তার অদৃশ্য শক্তি নিয়ে প্রচ্ছন্ন। প্রকৃতির বক্ষ থেকে মানুষের প্রাণ থেকে শক্তি শোষণ করে নিয়ে স্ফীত হবার যাদু সে জানে, তাই নিয়ে অমানুষিক নির্ম্মমতার নানা পরীক্ষায় সে নিযুক্ত। তার পরীক্ষাশালায় যে প্রবেশ করে সে বেরিয়ে আসে কঙ্কালসার হয়ে। তার অস্তিত্ব হয় ছায়ার মতো নিঃস্বত্ব। বিরাট এই জালের তৈরি বেড়া এর বাহিরে খোদাইকরদের কাটা নানা কালো কালো খানাখন্দগুলোই ক্ষুধার্ত্ত দানবের কবলের মতো পড়ে দৃষ্টিপথে। এইখানে তপ্ত ফাল্গুনের প্রখর আলোয় কোনো এক প্রমত্ত বসন্তদিন ফুটিয়ে তুললে একটি 'রক্তকরবী'। আনন্দহীন কর্ম্মের আবর্জনার একধারে মূল্যহীন আনন্দের ইসারা জমালে সেই ফুল! 'বিশু পাগল' সে আগলভাঙা প্রাণ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এই রক্তকরবীকে ঘিরে—মরুভূমির খোলা বাতাস যেন সে। কর্ম্মের শেষে যক্ষপুরে ওঠে 'চাঁদ', শান্ত তার দৃষ্টি—জাগায় নেশার অতৃপ্তি কারিগরদের মনে, মাত্‌লামির অট্টহাস্যের ধ্বনি জাগে, অশান্ত রাত্রির পারে তলিয়ে যায় চাঁদ মাতালের হাতে ভাঙাচোরা একটা স্বর্ণপাত্রের মতো।

প্রথম—

যক্ষপুরীর মানুষধরা ফাঁদে কখন্‌ ধরা পড়েছে নন্দিনী। ছিল সে ''রঞ্জনের'' নর্ম্মসখী, প্রেমের নন্দনবনে, এখানে এসেছে প্রাণগ্রাসী পাতালপুরীর হাঁ-করা গহ্বরের প্রদোষান্ধকারে। ''রঞ্জনের'' বাঁশির ডাকের সুর আসে নন্দিনীর চোখে, তার হাসিতে, তার চলায় বলায় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে যক্ষপুরীর বাহনের দল। তার কাছে ছুটে আসে ''কিশোর'', না-দেখা বনের রক্তকরবী

ফুলের সন্ধান দেয় নন্দিনীকে। ক্ষণে ক্ষণে ব্যাঘাত হয় অধ্যাপনায়, ওর কাছে কাছে ঘুরে বেড়ান 'অধ্যাপক', ইনি শক্তিতত্ত্বের আলোচনা করেছেন অনেককাল, এখন নন্দিনীকে দেখে অবধি আনন্দরহস্যের সীমা পান না। তাঁর নিরঞ্জন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে রক্তকরবীর রঙের অঞ্জন লাগল। রঞ্জনের বাঁশি ডাকে থেকে থেকে নন্দিনীকে কাজের ভিড়ের মধ্যেও। এই খবরটা জানে মালিক; আর সে এও জানে যে, যে সোনা সে পায় হাজার হাজার মানুষের প্রাণ দেউলে ক'রে সেই সোনা দিয়ে সে আনন্দ পায় না কণামাত্র। তাই সে ঐশ্বর্য্যের পিঞ্জরে গর্জ্জাতে থাকে বন্ধ্যা সম্পদের নিষ্ফলতায়। রঞ্জন আর নন্দিনীর মাঝে সে সৃষ্টি করতে চায় প্রচণ্ড বিচ্ছেদ। পিপাসার্ত্ত নীরস কণ্ঠের নিরানন্দ অট্টহাসি হাসে সে আপন জটিল জালের আড়ালে ব'সে—নন্দিনীর 'পরে তার নিগূঢ় টান নির্ম্মম ঈর্ষায় সাংঘাতিক হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়—

যক্ষপুরীতে ধ্বজা পূজার উৎসব লেগেছে— কর্ম্মক্লান্ত দিনের মাঝে একটুখানি অবসর, যার অবসান হল বীভৎস উল্লাস আর নিদারুণ ধ্বস্তাধ্বস্তি কোস্তাকুস্তির প্রাণান্তকর দৃশ্যে!

তৃতীয়—

শক্তিদেবীর কাছে অসংখ্য বলির মধ্যে রঞ্জনও কখন প্রাণ হারালো। তখন আর সইল না, নন্দিনী উঠল রুদ্রাণী হয়ে। জাল থেকে বেরোলো রাজা, অন্তহীন সংগ্রহের মোহ গেল তার ছুটে। বিদ্রোহ ঘোষণা করলে নিজেরই বিরুদ্ধে। মুক্তির প্রবল আবেগ, ধ্বংসের প্রচণ্ড ঝটিকা, নিরুদ্ধ শক্তির বিরাট ভূকম্পনের মধ্যে যক্ষপতির জয়যাত্রা শুরু হল নন্দিনীর হাতে হাত রেখে। মৃত্যুর তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হয়ে। ভেঙে পড়ল যক্ষপুরীর সেই ধ্বজদণ্ড যা পৃথিবীর মর্ম্মকেন্দ্র বিদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। আকাশে ছিন্নভিন্ন একটা গন্ধর্ব্ব নগরীর মতো মিলিয়ে গেল যক্ষপুরী, হাওয়ায় হাওয়ায়। যে কবর থেকে উঠেছিল সেই পুরী, সেই কবরেই তলিয়ে গেল বিরাট মিথ্যা- ভাঙন আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল একটিমাত্র রক্তকরবী গাছ। সবুজপাতার ছায়া শুকনো মাটিতে মেলে দিয়ে।

১৯৩৪-এ এপ্রিলের ৬ তারিখে কলকাতার নাট্যনিকেতন মঞ্চে অভিনীত 'রক্তকরবী'-র এই অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথের কোনো দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া জানা যায় না, তবে পরেরদিন হেমন্তবালা দেবীকে একটি পত্রে লিখেছিলেন: 'কাল 'রক্তকরবী'র অভিনয় থেকে শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে জোড়সাঁকোয় ফিরে তোমার প্রেরিত ফল ও মিষ্টান্নের অর্ঘ্য দেখে খুশি হয়েছি।'

টেগোর ড্রামাটিক গ্রুপের পর 'রক্তকরবী' অভিনীত হবার আর একটি সংবাদ জানা যাচ্ছে—১৯৪৫-এ দ্য নিউ স্টেজ কমিউনিয়ন দলের গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে, যার অভিনয় হয়েছিল মাত্র একটি রজনীর। আর একটি অভিনয় হয়েছিল শ্রীরঙ্গম মঞ্চে১৯৪৭-এ, উদ্যোক্তা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গণ-সংগঠন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'।দেবব্রত বিশ্বাস পরিচালক, তিনিবিশু পাগলের চরিত্রে রূপদান করেন। রাজা, নন্দিনী ও চন্দ্রা—এই তিনটি চরিত্রে রূপদান করেন যথাক্রমে শম্ভু মিত্র, কণিকা মজুমদার ও তৃপ্তি মিত্র। কালী ব্যানার্জী ও সজল রায়চৌধুরী করেছিলেন সর্দার ও গোঁসাই।

শান্তিনিকেতনে ওই ১৯৪৭-এ (অন্য মতে ১৯৪৬) ১৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভারতীর সিংহসদনে 'রক্তকরবী' অভিনয়ের একটি সংবাদ পাওয়া যায়, যার মঞ্জসজ্জা করেন নন্দলাল বসু এবং রূপসজ্জায় তাঁকে সাহায্য করেছিলেন রামকিঙ্কর বেইজ।

তবে ১৯৫৪-র মে মাস পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয় 'বহুরূপী'-র যুগান্তকারী 'রক্তকরবী' প্রযোজনা অব্দি যার অভিঘাতে নাটকের প্রকাশ্য রস আর গূঢ় অর্থ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল দর্শকদের বোধ ও বোধিতে। কুমার রায় সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'বহুরূপী'-র 'রক্তকরবী' অভিনয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "এমন নাট্যের কথা আগে কেউ ভাবেনি। মানুষ, মানুষের সমাজবিন্যাস—সে বিন্যাসে ধনবাদী সমাজের উৎকট চেহারা, স্বর্ণগৃধ্নুতার সঞ্চয় সরোবর আর বঞ্চিত মনুষ্যত্বের নিপুণ চেহারা। আবার চমক ভেঙে দেখল সবাই—নতুন নাটক, অভিনয়,

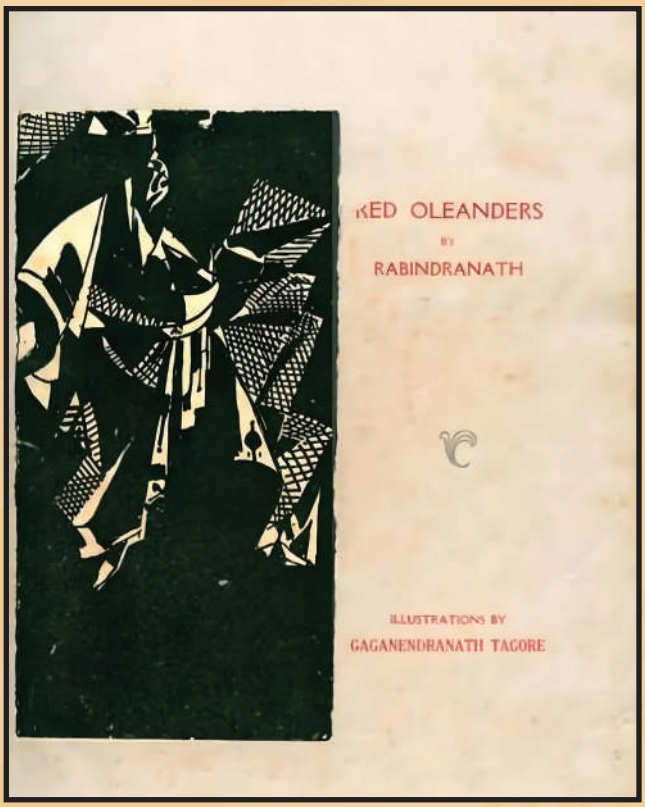

বিশ্বভারতী কোয়ারটার্লি, সেপ্টেম্বর ১৯২৪

'বিশ্বভারতী' প্রকাশিত 'রক্তকরবী'-র প্রচ্ছদ

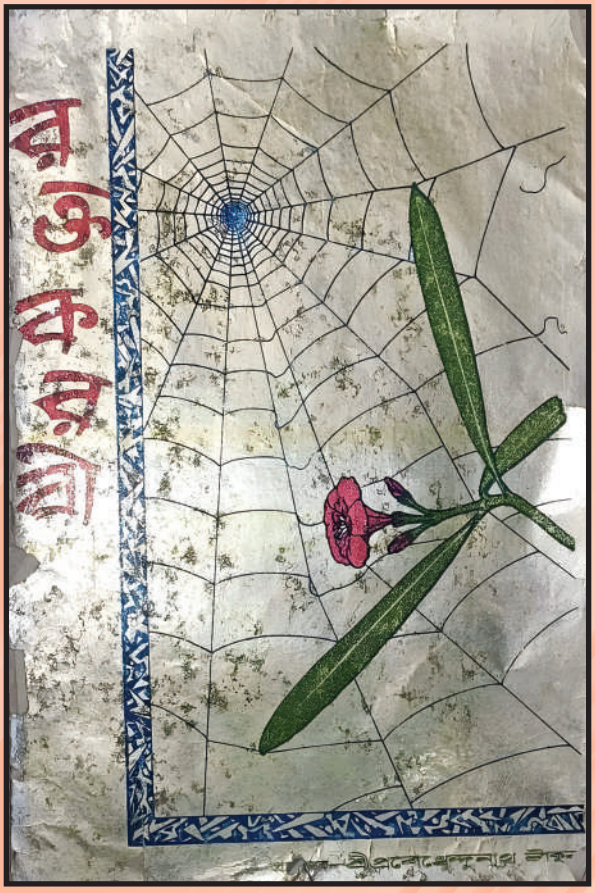

‘রক্তকরবী’ অভিনয়পত্রী
(টেগোর ড্রামাটিক গ্রুপ) ৬ এপ্রিল, ১৯৩৪

চিত্র : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(যক্ষপুরী:‘রক্তকরবী’)

নতুন দৃশ্যসজ্জা, আলোকসজ্জা সবই নতুন। অপেশাদারী থিয়েটারের সদর্থক ফল হল 'রক্তকরবী'। এই প্রযোজনা থেকেই শুরু হল নবীন যাত্রা আজকের থিয়েটারের। আজকের আন্দোলনে সেই প্রথম একটা আবেগ যুক্ত হল। আজ পেশাদারী নাট্য আন্দোলনের যে সদর্থক দিকটা আমরা দেখি তা দশ বছরের ব্যবধানে দুটি প্রযোজনা 'নবান্ন' এবং 'রক্তকরবী' না হলে সম্ভব হত না।"

শঙ্খ ঘোষ এই ঐতিহাসিক প্রযোজনা প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেনঃ "ইতিহাসের সূচনা হলো রক্তকরবী অভিনয় থেকে। কেননা এই অভিনয় থেকেই সমস্ত দেশ সচেতন হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়যোগ্যতা বিষয়ে, পুনর্বিবেচনায় বাধ্য হল দেশ...।"

ঐতিহাসিক এই 'রক্তকরবী' নাটকের নির্দেশক শম্ভু মিত্র তাঁর নানা লেখা এবং আলাপচারিতায় 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গে নানাভাবে আলোকপাত করেছেন। তারই একটি **'রক্তকরবী প্রসঙ্গে'** এই ক্রোড়পত্রে সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত করা হল। শম্ভু মিত্রের নিজের ভাষায় 'রক্তকরবী' প্রযোজনার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে—

'এই যে সমস্ত ঘটনাকে একটা নাট্যক্ষেত্রে আনা, এই অন্তর্জীবন আর বহির্জীবনকে একত্র বিবৃত করা, এই যে ব্যক্তি ও প্রতীককে একই রূপের মধ্যে প্রকাশ করা,—এইরকম নানান বৈশিষ্ট্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলুম। এবং সেইদিনই আমাদের বোধ হয়েছিলো যে বাংলা নাট্যের ভবিষ্যতে পৌঁছোতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়েই তবে যেতে হবে।'

প্রকাশের শতবর্ষ অতিক্রম করেও 'রক্তকরবী'র টেক্সট নানাভাবে পঠিত ও আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে, চলতি সময়ের নানান সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উত্তরণের দিক্‌চিহ্ন খুঁজে পেতে চাইছে, মণ্ডিত হয়ে উঠছে নতুনতর তাৎপর্যে; নাট্য-নির্মিতির সূত্রেও সেই সন্ধানের ধারা অব্যাহত।

'বহুরূপী'র স্মরণীয় 'রক্তকরবী' প্রযোজনার উত্তরকালে কয়েক দশক ধরে কলকাতা ও মফস্বলের বিভিন্ন নাট্যদলের প্রযোজনায় 'রক্তকরবী' নাট্যের অমিত সম্ভাবনার নানাকৌণিক বিচ্ছুরণ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এ-ব্যাপারে স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবী করতে পারে—'আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়' (নির্দেশনা: তৃপ্তি মিত্র), 'কসবা অর্ঘ্য' (নির্দেশনা: মনীশ মিত্র), 'তৃতীয় সূত্র' (নির্দেশনা: সুমন মুখোপাধ্যায়), 'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' নাটক বিভাগ' (নির্দেশনা: কুমার রায়), দিল্লির 'পূর্ব-পশ্চিম' ও 'সন্দর্ভ' (নির্দেশনা: গৌতম হালদার), 'পথসেনা' (অঙ্গন মঞ্চ আকারে সম্পাদনা ও উপদেশনা: বাদল সরকার), কৃষ্ণনগর 'সিঞ্চন' (নির্দেশনা: সুশান্তকুমার হালদার, কৃষ্ণনগর সংশোধনাগারের ষোলোজন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন), অশোকনগর 'অভিযাত্রী' (নির্দেশনা: কৌশিক চট্টোপাধ্যায়), বালুরঘাট 'ত্রিতীর্থ' (নির্দেশনা: হরিমাধব মুখোপাধ্যায়)', শ্যামবাজার 'অন্যদেশ' (নির্দেশনা: শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়; দৃষ্টিহীন কুশীলবদের দ্বারা অভিনীত), বাঁশবেড়িয়ার 'বৃশ্চিক' নাট্যসংস্থা (নির্দেশনা: তাপস মুখোপাধ্যায়), ভবানীপুর *'শিশিক্ষু'* (নির্দেশনা: চৈতি ঘোষাল)—ইত্যাকার আরো অনেক নাট্যদলের প্রয়াস।

‘রক্তকরবী’ : বিদগ্ধজনের বীক্ষণ

নেপাল মজুমদার

‘রক্তকরবী’র মর্মার্থ সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নাটকটির রচনার কয়েক মাস পর তিনি উহার প্রস্তাবনা ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যাহা বলিলেন, (প্রবাসী ১৩৩২ বৈশাখ) এই প্রসঙ্গে তাহা লক্ষণীয়। কবি বলিলেন,

‘‘স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনাস্থলের একটি ডাকনাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী বলে জানে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে পৌরাণিক কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখানকার রাজা পাতালে সুড়ঙ্গ খোদাই করে সে ধন হরণে নিযুক্ত। তাই আদর করে এই পুরীকে সমঝদার লোকেরা যক্ষপুরী বলে। লক্ষ্মীপুরী কেন বলে না? কারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভান্ডার পাতালে।

‘‘রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে-একটা মিল দেখছি, তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা।...

‘‘কর্ষণ-জীবী এবং আকর্ষণ-জীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। তাছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, যেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা, না একালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালিকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুটি ধরে টান দিয়েছিল।

‘‘আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষী-যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারি বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন। বাল্মীকির পক্ষে এ-সমস্তই পরবর্তী কালের, অর্থাৎ পরস্ব।’’

আধুনিক যুগ-সমস্যাকে এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখার পক্ষের যুক্তি দিতে গিয়া কবি আরও বলিলেন,

... ‘‘আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গল্পটার মধ্যে তারি প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিখেন দস্যু, তাবুপর দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল...’’

(গ্রন্থপরিচয়-রবীন্দ্ররচনাবলী-১৫’শ খণ্ড।। ৫৪৪-১৬)

আবার ইহার অল্পকাল পরেই (২৮ সেপ্টে: ১৯২৪) অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ‘রক্তকরবী’র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিলেন,

‘‘নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

‘‘এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশী; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।

''এমন সময় সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধন-জালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজে রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।'' (ঐ।। পৃষ্ঠা—৫৪৭)

প্রায় বৎসর খানেক পরে, বিলাতের 'Manchester Guardian'. পত্রিকায় আর একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ হইতে 'রক্তকরবী'র (Red Oleanders) ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন (২৮ আগষ্ট ১৯২৫),

......."But I think, in justice to myself, I should make it clear that it has a definite meaning which can legitimately claim literary expression."

"There was a time when, in the human world, most of our important dealings with our fellow-beings were personal dealings, and the professional element in society was never hugely disproportionate to the normal constitution of its life. Therefore, naturally, in the tradition of literature, which is the ideal expression of man's life, interactions of human relationship have so long occupied the most important position.

"To-day another factor has made itself immensely evident in shaping and guiding human destiny. It is the spirit of organisation, which is not social in character, but utilitarian. ..... Naturally, in all organisations, variation of personality is eliminated, and the individual members, in so far as they represent the combination to which they belong, give expression to a common type and very little to their uniqueness of individuality.

"But the personal man is not dead– only dominated by the organised man. The world has become the world of Jack and Giant-the Giant who is not a gigantic man– but a multitude of men turned into a gigantic system.

"I am not competent to say how Europe herself feels about this phenomenon produced by her science..."

"It is an organised passion of greed that is stalking abroad in the name of European civilisation. I know that this does not represent the whole truth as to its character, and therefore the pity of it is all the greater when mainly this aspect of it is forcibly presented to us, causing the spread of dumb sadness over a vast portion of the world and the dread of a devastation of its future into an utterly bankrupt life. Such an objectified passion lacks the true majesty of human nature; it only assumes a terrifying bigness, its physiognomy blurred through its cover of an intricate net-work, the scientific system. It barricades itself against all direct human touch with barriers of race pride and prestige of power. The impersonal pressure which, from its aloofness, it applies to our living soul is enormous, ever narrowing our prospect of growth, smothering the power of initiative in our mind..."

"Therefore it should cause no surprise to anybody if a poet, belonging to a continent swallowed by the menacing shadow of Europe, gives a prominent place among the *dramatis persone* of his play to an apparition which now so powerfully occupies the imagination of a vast world consisting of non-Western races. It is not an individual but a doom; and therefore it should never be compared to such characters as Lady Macbeth by those who wish to find a literary precedent. I am told that science has become a principal subject for some notable poets in Europe. That is natural, for science has permeated Western life; ..... In a similar manner– the hungry purpose, having science for its steed, running about unchecked, trampling our life's harvest, is not an intellectual generalisation unfit for imaginative literature. It is intensely real; its hot breath is upon us; its touch is all over our shrinking soul. It is the principal hero to-

day in the drama of human history; and I trust I have the right to invoke it in my own play, net in the spirit of a politician. but of a poet, possibly a lyrical poet."

[Visva-Bharati Quarterly-October 1925-pp. 283-85]

প্রশ্ন এই, আমরা কবির কোন ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিব?

সবগুলিই গ্রহণ করা যায়। তবে নাটকটি রচনার পশ্চাতে যেসব ভাবগুলিই নিহিত থাক না কেন, নাটকটির মধ্যে ঐ শেষোক্ত ভাবটিই বেশী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কৃষির সহিত যন্ত্রশিল্প-সভ্যতার দ্বন্দ্ব-বিরোধটি খুব পরিষ্কার ফুটিয়া উঠে নাই। যন্ত্রশিল্প-সভ্যতায় যন্ত্র ও জীবনের, যান্ত্রিক-সংগঠন ও মানুষের সজীব ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্ব সংঘাতটিই সব চেয়ে বেশী প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। যান্ত্রিক সংগঠনের কারাগার হইতে মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও প্রাণশক্তির মুক্তির বিজয়-বারতাই শেষ পর্যন্ত নাটকখানি হইতে ঘোষিত হইয়াছে। যক্ষপুরীর কারাগার যে ইউরোপ-আমেরিকার পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, নাটকখানিতে তা' স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু 'রক্তকরবী'র রূপক ও প্রতীক নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য দক্ষতা ও সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

প্রথমেই রাজপ্রাসাদের মধ্যে রাজাকে দেখা যাক। যক্ষপুরীর রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। রাজাকে কোথাও কোনদিন কেউই দেখিতে পায় না। নন্দিনীর ভাষায়, ''জালের কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের রাজা।''

ইহাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগতভাবে রাজা বলিয়া কেউ নাই; র‍্যাথচাইল্ড, বা ফোর্ডের মত কোন ধনকুবেরও ব্যক্তিগতভাবে রাজা নয়, এমনকি পুঁজিবাদীরাও নয়। পুঁজি বা 'capital-ই হইতেছে সেই রাজা। ইহাকেও চোখে দেখা যায় না; সারা দেশের কল-কারখানা, খনি-বাগিচা, জমি-জমা, পুকুর-জলাশয়, নদী-মাটি, আকাশে-বাতাসে অদৃশ্যভাবে ইহার প্রভুত্বের লৌহ বেড়াজাল (financial net-work) বিস্তৃত। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি—যাহারা প্রত্যক্ষতঃ রাষ্ট্রযন্ত্রটি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে-তাহারাও এই বেড়াজালে বন্দী। এই পুঁজির ধর্ম হইতেছে (motive force) ক্রমাগত আপনাকে সহস্রগুণিত করিয়া বৃদ্ধি করা;—এক মুহূর্তও ইহার থামিবার উপায় নাই। এই পুঁজিই রাষ্ট্রের আসনে (national state) বসিয়া 'জাতীয়-ইচ্ছা' ও 'জাতীয়-স্বার্থের' নামে দেশের আপামর জনসাধারণকে এক যাদুমন্ত্রবলে তাহার আপন স্বার্থে কাজ করাইয়া লয়। এঙ্গেলস্ পুঁজিবাদী সমাজে এই জাতীয়-রাষ্ট্রের স্বরূপ ও ভূমিকাটির একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন,

..... "The modern state, no matter what its form, is essentially a capitalist machine, the state of the capitalists, the ideal personification of the total national capital. The more it proceeds to the taking over of productive forces, the more does it actually become the national capitalist– the more citizens does it exploit"..

[Socialism: Utopian and Scientific-P.-106.]

রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই কখনও 'machine' বলিয়াছেন, কখনও organisation' বলিয়াছেন আবার কখনও বা বলিয়াছেন 'nationalism'। ...

কিন্তু পুঁজির ক্রমাগত আয়তন ও পরিমাণগত বৃদ্ধি যখন জাতীয় স্বার্থ ও 'জাতীয়-ইচ্ছার' রূপ লয় তখন শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষেরাও উহার কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া পারে না। অর্থাৎ পুঁজিবাদী-সংস্কৃতির ভূত সকলকেই আচ্ছন্ন করে, উহাই পুঁজিবাদী-সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।...

পুঁজির এই দানবীয় লোভ-বাসনার উন্মাদনা ও উত্তেজনার ঘূর্ণাবর্তে জীবন আজ পিষ্ট, ক্লিষ্ট ও চূর্ণিত হইয়া

আর্তনাদ করিতেছে। এমন কি পুঁজিবাদীরাও রেহাই পায় নাই। অর্থ ও সোনার কোন ব্যবহারিক মূল্যও তাহার কাছে নাই, তাহার ব্যক্তিগত ভোগলালসা চরিতার্থ করার জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন ততটুকুতেও সে শান্ত নয়। সোনার গুণগত কোন মূল্যও তাহার কাছে নাই; —সোনা তাহার কাছে অঙ্কশাস্ত্রের পরিমাণগত অগণিত সংখ্যার যোজনা ও দশমিক পৌণপুণিকতা মাত্র। ইহাকেই বলে 'gold fetishism'বা 'money-fetishism', রূপে-রসে-গন্ধেভরা বসুন্ধরায় জীবনকে স্বাভাবিক ও বলিষ্ঠভাবে ভোগ করিবার সময় ও অবকাশ তাহার নাই। ধনতান্ত্রিকসভ্যতায় জীবনের এই মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুতি ও বিকৃতির বীভৎসতা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে পীড়িত করিয়াছিল।...

রক্তকরবীর যক্ষপুরী যে ইউরোপ-আমেরিকার ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা,—এ'কথা নাটকখানিতে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

মুক্ত প্রাণের যাদুকরীশক্তি নন্দিনীর স্পর্শে সারা যক্ষপুরী একদিন জাগিয়া উঠিয়া আপনিই আপনাকে আবিষ্কার করিল,— এমন কি যক্ষপুরীর রাজাও। আর রঞ্জন ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ঐ দানবীয় বর্বরতার দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিবার এক মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপ্রাণের উদ্দাম তরঙ্গোল্লাস সৃষ্টি করিয়া গেল। যন্ত্রশিল্প সভ্যতা যেখানে জীবনের মুক্তধারাকে অবরুদ্ধ করিতেছে, অভিজিৎ ও রঞ্জন সেই অবরোধের বাঁধ-ভাঙ্গার-লড়াইয়ে নিজের জীবন দিয়া বাঁচিতে শিখাইয়াছে।

রক্তকরবীর বাণী অত্যাচারীর কাছে পদানত হইয়া থাকা নয়, আপোষ নয়,— পরাজিতের কণ্ঠে শান্তির ললিত বাণীও নয়। রক্তকরবীর বাণী, লড়াইয়ের-সংগ্রামের বাণী। বিক্ষুব্ধ জনতাকে রাজা জিজ্ঞাসা করে,

''রাজা—কী হয়েছে তোমাদের। কী করতে বেরিয়েছ।

ফাগুলাল—বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।

রাজা—ফিরবে কেন। ভাঙার পথে আমিও চলেছি। ওই তার প্রথম
চিহ্ন। আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্তি।

* * * * *

ফাগুলাল—... আমরা তোমারি বন্দীশালা ভাঙতে বেরিয়েছি।

রাজা—হাঁ, আমারি বন্দীশালা। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল—সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা—তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল—সৈন্যরা তো তোমাকে মানবে না।

রাজা—একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল—জিততে পারবে?

রাজা—মরতে তো পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি-বেঁচেছি।

ফাগুলাল—রাজা, শুনতে পাচ্ছ গর্জন?

রাজা—ওই-যে দেখছি, সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে।

* * * * *

''বিশু।—আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ওই চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায়।

ফাগুলাল—সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু—কোথায়।

ফাগুলাল—শেষ মুক্তিতে। —বিশু দেখতে পাচ্ছ ওখানে কৈ-শুয়ে আছে?

বিশু—ও-যে রঞ্জন!

ফাগুলাল—ধুলায় দেখছ ওই রক্তের রেখা?

বিশু—বুঝেছি, ওই তাদের পরমমিলনের রক্তরাখি। এবার আমার সময় এল একলা মহাযাত্রার।... আয়রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্।"

(রক্তকরবী-রবীন্দ্ররচনাবলী-১৫'শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬-১৮)

এইখানেই নাটকের যবনিকাপাত। মানবের রক্তপিচ্ছিল শাশ্বত যাত্রাপথের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া নাটকের যবনিকাপাত কী গভীর অর্থব্যঞ্জক নয়? রক্তকরবীর বাণী, মানবের মহাসংগ্রামের বাণী। রক্তকরবীর গান, মানবের অন্তহীন শাশ্বত-যাত্রাপথের গান।"

['ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' (দ্বিতীয় খণ্ড)]

উৎপল দত্ত

"'রক্তকরবী' ধর! ...তোদের যা যা বক্তব্য সব বলা হয়ে গেছে 'রক্তকরবী'তে, কিন্তু সেটা বলা হয়েছে এমন ছন্দে, সুরে, ভাবে যে কথাগুলো বুকে গিয়ে বাজে। এইখানেই বিপ্লবী সংস্কৃতির ভূমিকা। ...সেখানে 'রক্তকরবী' দৃষ্টিগ্রাহ্য কতকগুলি ঘটনা ও প্রতীকের সাহায্যে অতি মনোহর খাঁটি বাংলা ভাষায় এমনভাবে তুলে ধরেছে এযুগের শ্রেণীসংগ্রামের সারবস্তুটিকে যা শুধু মগজে আঘাত করে না, হৃদয় আলোড়িত করে। কার্ল মার্কস-এর শ্রমশক্তি বিক্রয়ের তত্ত্বটা জানিস? ...শ্রমশক্তি বিক্রয়ে বাধ্য মজদূরকে কী করে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতে বাধ্য করে পুঁজিপতিরা, তার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন মার্কস। তিনি দেখাচ্ছেন প্রক্রিয়াটা বৃত্তাকার সীমাহীন ঘানিতে বাঁধা বলদের মতন। এই অনাদি অনন্ত শ্রমের ফলে মজদুর বিযোজিত হয় সব সুকুমার বৃত্তি থেকে, হারায় ব্যক্তিত্ব, রুচি, কৃষ্টি, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার এমনকী ফিউদাল শোষণে ভূমিদাসের যে গ্যারান্টিগুলি ছিল, পুঁজিবাদের সুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক শোষণে শ্রমিক সে গ্যারান্টিও হারায়। এই তত্ত্বই 'রক্তকরবী'তে এসেছে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ পরিগ্রহ করে। যক্ষপুরীব শ্রমিকদের নাম গেছে হারিয়ে, পিঠে আঁকা ৪৭ফ আর ৬৯ঙ সংখ্যাই তাদের পরিচয়। তাদের মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয়েছে, তারা এক অন্ধ শোষণযন্ত্রের নাটবল্টু। বিষ্ণু যখন বলে—

> শেষে দেখি যক্ষপুবীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়, এখন তার জঠরের মধ্যে যাবার একটি পথ ছাড়া আর পথই নেই। আজ সেই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেছি—

অথবা

> একদিনের পর দুদিন, দুদিনের পর তিন দিন, সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের পর দু হাত, দু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি, এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা।

... মার্কস দেখিয়েছিলেন, শ্রমের প্রাবল্য, একঘেঁয়েমি, কাজের সময় বাড়ানো, কাজের হার প্রভৃতির ফলে শ্রমিকের ব্যক্তিসত্তা লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে—বিশু তো ঠিক তাই বলেছে। সে কথারই তো প্রতিধ্বনি শুনি যখন নন্দিনী জিজ্ঞাসা করে—

ওই কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে?

সর্দার।। ওদের আমরা বলি রাজার এঁটো।

নন্দিনী।। মানে কী?

সর্দার।। মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক।

নন্দিনী।। এখন গেল কোথায়?

...এই শোষণের বিরুদ্ধে যক্ষপুরের কারিগরদের বিদ্রোহটাই হচ্ছে 'রক্তকরবী' নাটক। কে বলেছে ওরা শুধু পড়ে পড়ে মার খায়? গজ্জু টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু একটাই তার প্রার্থনা:

দয়াময় ভগবান, জীবনে যেন একবার জোর পাই আর ক'দিনের জন্যেও। ...কেবল ওই সর্দারটার ঘাড় মটকে দেবার জন্য। সর্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি।

যেখানে অত্যাচার সেখানেই প্রতিরোধ। গজ্জুর কথায় সর্বহারার প্রাথমিক অন্ধ ঘৃণার প্রকাশ। কিন্তু সেখানেই রবীন্দ্রনাথ ছেদ টানেননি যদিও টানলেও আমাদের কিছু বলার থাকত না। ... তুলনায় গজ্জুর আক্রোশ আর শ্রেণী ঘৃণা আমাদের হাতে ঢের বেশি ধারালো খড়্গ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিছক ঘৃণা থেকে এগিয়ে গিয়ে নিয়ে এসেছেন রঞ্জনকে। রঞ্জনের নামোচ্চারণেই শান্তিপ্রিয় পণ্ডিতের দল অনুস্বার বিসর্গের হাট বসিয়ে তাকে নানা কোমল ও অলৌকিক ভাবের প্রতীক বানাবার চেষ্টায় মাতেন। এঁরা চেপে যান প্রতীকেরও দ্বৈত সত্তা থাকে। একদিকে সে স্রষ্টার কোনো মতের বাহন হতে পারে; কিন্তু অন্যদিকে কাহিনীর সীমানায় সে এক বাস্তব চরিত্র হয়ে আসতে বাধ্য। রঞ্জন কোন গূঢ় তত্ত্বের বাহন আমি জানি না, আদৌ কোনো বাহন কিনা তাতেও আমার সন্দেহ আছে। আমার ধারণা সে শুধু মুক্তির দৌবারিক, বিদ্রোহী উল্লাসের কাব্যময় রূপ। কিন্তু নাট্যকাহিনীর লজিকে সে কে? কী তার ভূমিকা? এদিকটা চাপবার এত উৎকট প্রয়াস কেন? সে স্পষ্টতই বিপ্লবী, সচেতন এক বিদ্রোহীঃ 'হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই।' তাই তাকে শিকল দিয়ে বাঁধতে ছুটেছে সর্দারের লোকেরা। অর্থাৎ রঞ্জনকে গ্রেপ্তার করতে চায় ওরা।

> মোড়ল বলে, 'শিকল দিয়ে তো ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এসেছে—ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল করে, চেহারা বদল করে। আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাকলে খোদাইকরগুলো পর্যন্ত বাঁধন মানবে না।'

একথার মধ্যে বায়বীয় সব তাৎপর্য খুঁজে মরুক ভাববাদী পণ্ডিতের দল। নাটকের চৌহদ্দির মধ্যে এর অর্থ স্পষ্ট, সরাসরি বাস্তব। রঞ্জন বন্দীদশা থেকে পলায়ন করেছে; সে ছদ্মবেশ ধারণে দক্ষ। সে পালিয়ে চলে এসেছে ব্রজগড় থেকে কুবেরগড়ে। সে খোদাইকরদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন দলের পর দল নির্ভীক বিপ্লবী যুবকদের, যাঁরা সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে দেশের মুক্তি কামনা করতেন, সাম্রাজ্যবাদের ভাষায় যাঁদের নাম 'সন্ত্রাসবাদী'। বিশুকে যখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে, নন্দিনী শুধোয়, 'কী দোষ করেছ যে এরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে চলেছে?' বিশু জবাব দেয়:

এতদিন পরে আজ সত্য কথা বলেছিলুম।

...আর রঞ্জন যে শুধুই এক অতীন্দ্রিয় অলৌকিক পুরুষ নয় তার প্রমাণ হিসেবে বিশু কিশোরকে বলে যাচ্ছে—

এখন ধরা পড়লে চলবে না। একটা বিপদের কাজ করবার আছে। রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন করে পারিস তাকে বের করতে হবে। সহজ নয়।

এই সব নির্দেশ বহুদিন যাবৎ বিশ্বের সব বিপ্লবীরা দিয়ে যাচ্ছেন সহযোদ্ধাদের। এই প্রত্যক্ষ সত্যকে এড়িয়ে রঞ্জনের মধ্যে শুধুই 'প্রকৃতির ছন্দ' আর 'মানবাত্মার সংকেত' খোঁজার অর্থ হল রবীন্দ্রনাথকে এমন এক ব্যর্থ নাট্যকার বলা, যিনি গল্পের গাঁথুনির তোয়াক্কা রাখতেন না, যাঁর চরিত্রগুলিব প্রাথমিক যুক্তিও নেই, যাঁর নাটকের আত্মা আছে দেহ নেই। সাংকেতিক বা প্রতীকী নাটকের ধর্মই তাই-তার চরিত্ররা গূঢ় অর্থবহ হতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের হাড় রক্ত মাংসের স্থূল মনুষ্যও হওয়া চাই। যে সব পণ্ডিত রবীন্দ্রনাট্যের রক্তমাংসের দিকটাকে উপেক্ষা করে শুধুই স্বপ্নের দিকটাকে ধাওয়া করেন, তাঁরা তোদেরই মতন অসুর। তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভেঙে ফেলছেন, নাট্যকার হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ধ্বংস করতে চাইছেন। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা বিশুদ্ধ ভাববাদী বানাবার চেষ্টায় আছেন।

রঞ্জন-বিশুদের বিদ্রোহের কথাটা বুঝলে তবেই শুধু বোঝা যাবে রঞ্জনের মৃত্যুর তাৎপর্য, বোঝা যাবে কেন তার শবদেহের উদ্দেশে নন্দিনী বলে, 'তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে!' তাই তো হয়। তোদের আত্মদান থেকে শুরু হয় বিজয় অভিযান। মৃত্যুতে লড়াইয়ের শেষ নয়, শুরু। নন্দিনীর কথায়—

নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি-যে এই শুনতে পাচ্ছি।

রঞ্জন বেঁচে উঠবে-ও কখনো মরতে পারে না।

রঞ্জনের মৃত্যুকে সামনে রেখেই বুঝি বিশুর কথা:

আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ওই চলেছে লড়তে।

... আয়রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্।

...রবীন্দ্রনাথকে জাদুঘরে বন্দী করে ফেলতে চায় শত্রুরা, তাঁকে করতে চায় কণিষ্কের কবন্ধ মূর্তি, বিশেষজ্ঞের গবেষণার লক্ষ্য, ইতরজনের বুদ্ধির অতীত। বাজে কথা। রবীন্দ্রনাথ জ্যান্তো, আজকের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তিনি আছেন আমাদের পাশে। নির্জীব কীটদষ্ট পুঁথি তিনি নন, তিনি নন পুরাতত্ত্ব। তিনি এখনো সংগ্রামের স্লোগান।...''

['রবিঠাকুরের মূর্তি/ 'জপেনদা জপেন যা']

শঙ্খ ঘোষ

"... রবীন্দ্রনাথ মনে রাখতে বলেছিলেন, রক্তকরবী নাটকটায় আছে নন্দিনী নামে এক মানবীর কথা। সমালোচকেরা আমাদের শেখাতে চান নন্দিনী হলো আনন্দের প্রতীক, রঞ্জন যৌবনের, রাজা শক্তির অথবা দর্পের অথবা যন্ত্রের অথবা আরো আরো অনেক কিছুর আর তাছাড়া রাজা আর রঞ্জন না কি একই লোক। সরল শাদাসিধে একটি গাঁয়ের মেয়ে নাগরিক জটিল পরিবেশের মাঝখানে এসে অবাক হয়ে গেছে, ভয় পায়নি তবু, সবাইকে সহজে সে আনন্দ দিতে পারে আনন্দ পেতেও পারে—এই কথা বলা, আর একটি মেয়েকে 'আনন্দের প্রতীক' বলবার মধ্যে মানসিক দূরত্ব ঘটে যায় অনেকখানি। কেননা তখনই আমরা ভাবতে শুরু করি যে এ আমাদের জীবন থেকে সরানো অনেক উঁচু ধরনের কথাবার্তা, শ্রদ্ধেয়, অভিনিবেশযোগ্য, কিন্তু আমার-আপনার নয়। আমাদের শেখানো হয়, রক্তমাংসের মেয়ে নয় নন্দিনী। রক্তমাংসের মেয়ে হলে কি কেউ রঞ্জনের কিশোরের মৃত্যুসংবাদ জানবার পরপরই সদ্যশোকের মুখে ওইভাবে বলতে পারত 'রাজা, এইবার তোমার সঙ্গে আমার লড়াই'? রঞ্জন আবার আসবে (যে মরে গেছে সে আর আসে কী করে যদি নিছক তত্ত্বকথা না হয়), এই বিশ্বাস নিয়ে কি সে ছুটে যেতে পারত তখন নতুন একটা লড়াইয়ের দিকে, ওইরকম এক দশায়, মানুষ যদি হতো? যে-দেশে বসে সফদার হাশমিদের খুন হতে দেখি আমরা চোখের সামনে, যে-শহরে শুনতে পাই শোকের জমায়েতে এসে সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়ে মালা হাশমি বলেন: 'এটা শোকের সময় নয়, আমাদের সামনে এখন লড়াই, সফদারের মৃত্যু ব্যর্থ হবে না', সেই শহরে তো সেখান থেকেই শুরু হতে পারত 'রক্তকরবী'র পাঠ, নন্দিনীকে ছোঁয়া। এই তো সেই নাটক যেখানে আমাদের চিনিয়ে দেওয়া হয় সমাজের কোন্ অবস্থায় অল্প কয়েকজনের সমৃদ্ধি একেবারে শিখরে ওঠে, অন্তর্বিরোধে ভেঙে পড়বার আগে (মনে করুন চিকিৎসকের কাছে বলা সর্দারের এই সংলাপ: ... হায় হায়, কী দুঃখ। আমাদের স্বর্ণপুরী যে-রকম ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছিল এমন কোনোদিন হয় নি, ঠিক এই সময়টাতেই), আর সেই শিখর তৈরি হয় অনুপ-শক্‌লুদের মতো অজস্র যুবককে একেবারে ছিবড়ে করে দিয়ে, গজ্জুর মতো পালোয়ানদের ভিতরে ভিতরে ফাঁপা করে দিয়ে, গোকুল-ফাগুলালদের মতো শ্রমিকদের অবসর-কালকে মদের মধ্যে ডুবিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করে দিয়ে, আর রঞ্জন-বিশুদের কেবলই জেলে ভরে দিয়ে। যে দেশে বসে কেবলই আমরা দেখতে পাই গলিতে গলিতে নেশার পর নেশা জুগিয়ে যাবার আয়োজনের বিরাম নেই কোনো; আর ঠিক তেমনি বিরাম নেই একোণে-ওকোণে নিত্যনতুন ধর্মপীঠের জেগে-ওঠা, নিত্যনতুন গোঁসাইবাবা বা মৌলবিদের আবির্ভাবের; বিরাম নেই এখানে-ওখানে সান্ত্রিচলাচলের, বারুদসমাবেশের; সেখানে ফাগুলালের এই সংলাপকে ভেবেছি নিছক একটা সাজানো কথা যে 'দেখনি ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে?' প্রথম থেকে দশম খসড়া পর্যন্ত অনেক সংযোজনে চেহারা পালটে গেছে এ-নাটকের, কিন্তু এই বীজবাক্যটি শুধু যে এর প্রথম পাঠ থেকে আছে তা নয়, এক হিসেবে এই সংলাপেই ছিল প্রথম পাঠের প্রায় সূচনা। নেশা ধর্ম আর অস্ত্রের তিন পথ দিয়ে কীভাবে মানুষকে দমিয়ে রাখা যায় আর শুষে নেওয়া যায়, তার ছবিটা প্রকটভাবে দেখিয়ে দিতে কোনো ইতস্তত করেননি রবীন্দ্রনাথ, এমনকী যেন এর পারম্পর্যটাও দিয়েছেন সাজিয়ে, যখন গোঁসাইকে দিয়ে সর্দারের কাছে বলান তিনি : '... দন্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড়বড় করছে, মূর্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে।

মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল বলে। তবু আরো কটা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তারপর আমাদের পালা।' অর্থাৎ তার পরই মৌলবাদ।

মানুষকে কীভাবে যন্ত্র করে নেওয়া হয়, আদ্যন্ত কীভাবে যন্ত্র হয়ে যায় সে, তার একটা কৌতুকমুখী ছবি আমাদের দেখিয়েছিলেন চ্যাপলিন তাঁর Modern Times ছবিতে, অনেকেরই চোখের সামনে নিশ্চয় আছে সেটা। সে-ছবিরও তেরো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যখন তৈরি করছিলেন যান্ত্রিকতার এই কাহিনী, গোটা সমাজটার, গোটা system-টার যান্ত্রিকতা, তখন তিনি কেবল সেই মুহূর্তেরই নয়, আমাদের এই মুহূর্তেরও দৈনন্দিন বাস্তবতার কথাই যে বলছিলেন, সেইখান থেকেই তো শুরু হবে 'রক্তকরবী' পড়া? একদিকে আছে কতরকমের ভালোবাসার চেহারা, রঞ্জন-নন্দিনীর রাজা-নন্দিনীর বিশু-নন্দিনীর, এমনকী অন্য এক ধরনে-চন্দ্রা-ফাগুলালের। আর অন্যদিকে ভিতরে-ভিতরে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ঘনিয়ে তুলবার আয়োজন, বিশুর রঞ্জনের কিশোরের ফাগুলালের!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকে শুরু করে জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট নাট্যকারেরা মানুষের ব্যক্তিসত্তা লোপ পাবার যে সংকটটা দেখাচ্ছিলেন তাঁদের রচনায়, দেখছিলেন মানুষ কীভাবে হয়ে যায় মুখোশমাত্র বা সংখ্যামাত্র, অতিনিয়মবদ্ধতার regimentation-এ কীভাবে শুকিয়ে যায় সমস্ত প্রাণ, তার মধ্যে তো পরাবাস্তব বায়বীয় কোনো কাণ্ডকারখানা নেই, আছে আমাদেরই কথা। তাই ৪৭ফ বা ৬৯ঙ হয়ে যাওয়া মানুষগুলিকে একেবারে আমাদের কাছাকাছিই প্রতিদিনেরই যাপনের মধ্যেই দেখতে পাবার কথা, ট্রামেবাসে ঘুরতে-ঘুরতেও। দেখতে পাবার কথা, কীভাবে 'these laborers, who must sell themselves piecemeal, are a commodity, like every other article of commerce'। আর কী হয় তখন, সেই শ্রমিকদের? 'He becomes an appendage of the machine'।

অনেকেই নিশ্চয় ধরতে পারছেন যে এই শেষ কথাগুলি উঠে এল একেবারে Communist Manifesto থেকে। এর সঙ্গে, এই 'Commodity' বা 'sell themselves piecemeal'-এর সঙ্গে একবার মিলিয়ে ভাবুন অধ্যাপকের সংলাপ: 'সব জিনিসকেই টুকরো করে আনা এদের পদ্ধতি' কিংবা 'ও কাউকে আস্ত রাখতে চায় না'। কিংবা বিশুর কথা 'তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা।' কিংবা প্রেতপুরীর দরজা খুলে বেরিয়ে আসা মানুষদের বিষয়ে সর্দারের এই বিবরণ: 'ওদের আমরা বলি রাজার এঁটো।' 'রাজার এঁটো': এই যেন 'the appendage of the machine'। এই-যে ব্যবস্থা, 'It has converted the physician, the lawyer, the priest, the poet, the man of science into its paid wage laborers'-ম্যানিফেস্টোর এই লাইনগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, আমাদের নাটকটিতেও কীভাবে আমরা দেখতে পাই যে চিকিৎসক গোঁসাই বস্তুবাগীশ-অধ্যাপক বা পুরাণবাগীশ-অধ্যাপকেরা বেতনভুক অস্তিত্বে মাত্র পৌঁছে গেছে, তাদের কারোই আর নিজেদের মনে হয় না পুরো মানুষ, সবাই আছে এক-একটা জালের পিছনে।

একজন, বা কেউ কেউ, ভাবে রাষ্ট্রকে বা সংগঠনকে চালাচ্ছে যেন সে-ই। যে-ব্যবস্থাটা গড়ে তোলা হয়েছে, সর্বশক্তিময় সেই ব্যবস্থার নিয়ন্তা যেন সে-ই। কিন্তু হঠাৎ হয়তো একদিন সে টের পায়, সে নিজেও কখন বাঁধা পড়ে গেছে সেই শক্তিরই কাছে, তার নিজের গড়ে-তোলা সংগঠনে। চালাচ্ছে না সে, সেও চালিত হচ্ছে শুধু সেই দানবিক system-এর হাতে। তাই প্রত্যাশিতই লাগে রঞ্জনের মৃতদেহ দেখবার পর রাজার এই আন্তরিক আর্তনাদ: 'ঠকিয়েছে, এরা ঠকিয়েছে আমায়। আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না।'

...নাটকটির বিষয়ে অনেকবার ইংরেজিতে ব্যাখ্যান শুনিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেইসব ব্যাখ্যা থেকে, আর সেইসঙ্গে আরো দু-একটি উৎস থেকে আমাদের এই আধুনিক সমাজের কয়েকটি বিবরণ এখানে সাজিয়ে নিই যদি, যদি ভাবি যে এ হলো এমন এক সমাজ 'a society that has conjured up such gigantic means of production and of exchange, is like the sorcerer, who is no longer able to control the power of the nether world whom he has called up by his spells': নিজেরই জাদুবলে গড়ে-তোলা শক্তির হাতে বাঁধা পড়েছে সমাজ, তার আর আজ শক্তি নেই 'to control'। বা অন্য একটি কথা:

'The machine refused to obey the hand that guided it. It was like an automobile that is going, not in the direction of the man who is driving it, but in the direction desired by someone else, as if it were being driven by some secret illegal hand'। নিজের হাতে তৈরি সেই যন্ত্র, যা নিজেকে আর মানছে না— 'the car is not going in the direction that man at the wheel imagines'। কিংবা এসবেরই সঙ্গে ভাবি আরেকটা কথা যে আজ 'The world has become the world of Jack and Giant-the Giant who is not a gigantic man, but a multitude of men turned into a gigantic system'।

এই কথাগুলির একটি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর নাটকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। একটা কথা লেনিনের, ১৯২২-এর পার্টি কংগ্রেসে। আর অন্য একটি সরাসরি মার্ক্স থেকে নেওয়া, তাঁদের ম্যানিফেস্টোর। কিন্তু কোন্‌টা কার? খুঁটিয়ে দেখলে বুঝতে পারা শক্ত নয়, সর্বাত্মক বিশ্লেষণে এর একটির সঙ্গে অন্যটির নিশ্চয় অভিপ্রায়গত দূরত্বও কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু এই-যে প্রথম উদ্ধৃতির gigantic means of production-এ আত্মবন্দী হয়ে যাবার কথা আছে ম্যানিফেস্টোতে; এই-যে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে, চালকের হাত অগ্রাহ্য করে যন্ত্রটির আপনমর্জিতে চলবার কথা বলছেন লেনিন; আর এই যে তৃতীয় উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন অসংখ্য মানুষকে পিণ্ড পাকিয়ে বানিয়ে তোলা হয়েছে এক gigantic system: এই কথাগুলির সঙ্গে আমাদের যদি যুক্ত করে দেয় নাটকের একটি-দুটি-পাঁচটি লাইন, তাহলে আমাদের প্রতিদিনের সেই যক্ষপুরী থেকেই এগোতে পারি নাটকটির দিকে, যে-যক্ষপুরীতে আমরা সবাই আছি 'মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে' কোনো-না-কোনো জালের পিছনে, যেখানে কাজের সঙ্গে আনন্দের একেবারে আড়াআড়ি বিরোধ, যেখানে সকলেই' কেমন রেগে আছে, কিংবা সন্দেহ করছে, কিংবা ভয় পাচ্ছে।'

আশা করি কেউ ভাবছেন না যে এ-রকমভাবে পড়তে গিয়ে মার্ক্সবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে একাকার করে তুলছি আমি। না, তা সম্ভব নয়। সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কতগুলি ব্যাধিলক্ষণকে চিহ্নিত করবার কাজে কোথাও কোথাও সমতা ছিল এসব ভাবনার মধ্যে আর সেটা-যে আমাদের চোখ-মেলে-চলা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায় অনেকটা, লক্ষ করার শুধু এইটুকুই। ব্যাধিটাকে উৎপাটনের পথ হিসেবে সকলে নিশ্চয় একই দিকের নির্দেশ দেন না, কিন্তু তবুও এটা মনে রাখতে হয় যে প্রত্যক্ষ একটা লড়াইয়েরই ডাক ছিল ওই নাটকের শেষে, যে-লড়াইতে ফাগুলালের মতো শ্রমিকদের সঙ্গে এসে মিলতে চেয়েছিলেন বুদ্ধিজীবী 'man of science'-ও, পুঁথির জাল থেকে বেরিয়ে এসে। এই নাটক পড়তে গিয়ে (বা দেখতে গিয়ে) যদি সেই বেরিয়ে-আসাটাকে আবার কেবল 'পুঁথি'রই মধ্যে রুদ্ধ করে নিয়ে ভাবি, তাহলে নিশ্চয় মূল থেকেই ব্যাহত হয়ে যায় নাটকটার উদ্দেশ্য।

যথার্থ সেই পড়াতে, লেখাকে জীবনের মধ্যে লিপ্ত করে নিতে, শব্দপ্রতিমাকে বিশেষভাবে পণ্য করাটা যে কোনোই কাজে লাগে না তা নয়। যদি সেটা নিজেরই জন্য নিজের বিশ্লেষণ না হয়ে ওঠে, যদি তার মুখ থাকে সেই বিষয়ের দিকে, সেও তো তবে জীবনেরই কাছে পৌঁছে দেবার পথ। তখন, তার ব্যাখ্যানে একজনের সঙ্গে অন্যের অল্পবিস্তর দূরত্বও তৈরি হতে পারে নিশ্চয়। শম্ভু মিত্র যাঁর 'রক্তকরবী' প্রযোজনা থেকে রবীন্দ্র-নাট্যপাঠের একটা যুগগত বদল ঘটে গেছে, যাঁরা অভিনয় থেকে আমাদের অনেকেরই এসব নাটক বিষয়ে প্রথম চেতনা তৈরি হয়েছে বলা যায়-তিনি যখন প্রথম অভিনয়ের চল্লিশ বছর পরে আজ বলেন, নাটকের শেষ গানটিতে আছে এক অপচয়ের ধারণা, কেননা 'ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে'কে পালটে নিয়ে এখানে বলতে হলো 'ধুলার আঁচল ভরেছে'-তখন আরেকজন পাঠক হয়তো না-ও মানতে পারেন সেটা। 'একটা ভ্রান্ত সংগঠন জোর ক'রে সমাজের ওপর চাপিয়ে না রাখলে'—শম্ভু মিত্রেরই কথা উদ্ধৃত করছি আমি—'যৌবনকে তার কর্মক্ষেত্রে মুক্ত রাখলে, এত পাকা ফসল আজ ধুলার মধ্যে ঝ'রে পড়ত না।... ডালা ভরা পাকা ফসলের এত অপচয় ঘটত না।' কেউ হয়তো তখন প্রশ্ন করতে পারেন, যদি অপচয়েরই কথা বলতে চাইবেন নাট্যকার, তাহলে কি গানের ভাষায় আসতে পারত ওই 'আঁচল' শব্দটা? কিংবা 'ভরেছে' শব্দটা? ধুলোতেই যদিও, তবু আঁচলে ভরে নেবার এই ছবি কি কোনো অপচয়? অপচয়ই যদি হতো, তবে কি শুনতে পেতাম নন্দিনীর ওই তেজোগর্ভ কথা, 'মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি-যে এই শুনতে পাচ্ছি'? দেখতে পেতাম কি তবে গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে মৃত রঞ্জনের দৃপ্ত আর ঊর্ধ্বমুখী ওই শয়ানভঙ্গি? অল্প কয়েক লাইনের ব্যবধানে যখন রঞ্জনের দিকে নির্দেশ করে বিশুকে বলে ফাগুলাল 'ধুলায় দেখছ ওই রক্তের রেখা' আর 'ধুলায় লুটচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ', আর তারপরেই গানে যখন শুনতে পাই 'ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে', তখন 'রক্তরেখা' 'রক্তকরবী' আর 'পাকা ফসল' মিলেমিশে গিয়ে মৃত্যুই হয়ে ওঠে একটা সঞ্চয়-কোনো আধ্যাত্মিক অর্থে নয়, কোনো অলৌকিক অর্থে নয়-একেবারে এই অর্থে যে সমাজবদলের সংঘর্ষে অনিবার্য কিছু মৃত্যু আমাদের স্তব্ধ করে দিতে পারে না কখনো, সে হয়ে ওঠে শুধু আমাদের পরবর্তী কাজের প্রেরণা, এই অর্থেই শোনা যায় তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর, অনপচিত জীবন। 'কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে', রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এমনও-যে একটা সূচনা আছে এ-নাটকে, ওইভাবে দেখলেই হয়তো আমরা পৌঁছতে পারি কবির নিহিত সেই অভিপ্রায়ের কাছে।"

['কবির অভিপ্রায়': শঙ্খ ঘোষ]

‘নন্দিনী’ : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

'বহুরূপী'র রক্তকরবী : শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র

নন্দিনীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র

পুনর্মুদ্রণ

রক্তকরবী প্রসঙ্গে

শম্ভু মিত্র

রক্তকরবী নাটক আমরা কী ভেবে অভিনয় করেছি—অর্থাৎ কী উদ্দেশ্যে ওই রকম দৃশ্যসজ্জা করেছি, ওই রকম পোষাকাদি পরেছি, ওই রকমভাবে কথাগুলো বলেছি—এইটা জানবার অনেকেরই কৌতূহল। আর তাই এই লেখাটার অবতারণা।

অবশ্য, চেষ্টা সত্ত্বেও ঠিক কথাটি গুছিয়ে বলতে পারবো কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট শঙ্কা আছে। কারণ, এ প্রশ্নটা অনেক লোকের কাছ থেকে যখন তীব্রভাবে এসেছে তখন আবার আমরাই ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমাদের মনে হয়েছে—আরে, এ ছাড়া আর কী হতে পারে! সে কথা বলেওছি। কিন্তু যাঁরা তীব্রভাবে প্রশ্ন করেছিলেন তাঁরা সন্তুষ্ট হন নি। তাঁদের মধ্যে কোনও অবিকৃতমস্তিষ্ক মানুষ রক্তকরবী প'ড়ে এই মানে মনে করতে পারে না। যে পারে সে হয় উন্মাদ, নয় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

উদ্দেশ্য একটা ছিল। এবং সেই উদ্দেশ্যে আমরা আরো অনেক কিছু করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অক্ষমতাবশত পারিনি। সে উদ্দেশ্য হোল লোকের ভালো লাগানো। সেই উদ্দেশ্যেই আমোদপ্রমোদের জগতের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা সর্বদা যৌন মোহের কথা বলে থাকেন, এবং বলে থাকেন যে রবীন্দ্রনাথের লেখা কেবল বুদ্ধিজীবীদের জন্য, এবং জনচিত্তে নাকি তাতে আলোড়ন সৃষ্টি করে না। তবে আমাদের চিন্তাটা একটু ভিন্ন। আমরা মনে করেছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের ক্ষমতা সমুদ্রের মতো বিরাট, তাতে আপামর জনসাধারণের চিত্ত আলোড়িত হতে বাধ্য। তাই আমরা সেই ভালো লাগানোর চেষ্টাই করেছি। যতোটা পেরেছি।

আমাদের *রক্তকরবী* ভালো লাগে। যেমন অনেকেরই লাগে। অনেক বারই আমাদের মনে হয়েছে যে ওটা অভিনয় করি। আবার প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে যে আমরা পারবো না। আমাদের পক্ষে এ কাজ অত্যন্ত কঠিন। তারপর একদিন খালেদ চৌধুরী বহুরূপীতে এলেন। এবং রয়ে গেলেন। —লোকটির অস্বাভাবিক ক্ষমতা। আঁকতে পারেন, যে কোনও বাজনা বাজাতে পারেন, গান শেখাতে পারেন, আর যতো নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে পারেন। তাঁকে পেয়ে আবার আমাদের মাথায় *রক্তকরবী* চিন্তা পেয়ে বস্‌ল।

পড়া হোল সকলে মিলে। একদিন না, বেশ কয়েকদিন। সকলেরই ভালো লাগে। রোজই ভালো লাগে। তারপর হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল *রক্তকরবী* করবো। সকলেরই মনে হচ্ছিল, করা যাক, না করলে ভালো লাগছে না।

শুরু হোল মহলা। এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যসজ্জার কল্পনা চলতে লাগল। নাটকটি একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ, কোনও ছেদ নেই। এবং সেই একই স্থানে রাজাও আছে, সর্দারও আসছে, আবার মজুর বা তার স্ত্রী এসে তাদের নিজেদের কথাও বলাবলি করছে। তারপর কতক্ষণের কাহিনি তারও কোনও হদিশ পাওয়া যায় না।

কিশোরের কাজে যাবার কথা হয়, কিন্তু ফাগুলাল এসে বলে তাদের সবার ছুটি। গগনবাবুর আঁকা বিশু ও নন্দিনীর ছবিতে রাত্রির চেহারা। আরও অনেক পরে নন্দিনী বলে— ''দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল.....''

এসব রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ভেবে বুঝে করেছেন। কিন্তু কী ভেবে করেছেন? আমরা ভাবলাম, এটা হচ্ছে

যক্ষপুরীর একটা সমগ্র চেহারা। এটা ঠিক কোনও একটা বিশেষ দিনের চেহারা নয়। অনেক বিশেষ দিনের একটা একত্রিত চেহারা। যদি হুবহু বাস্তবের চেহারা দিতে হয় তাহলে একটা বিশেষ দিনের কাহিনি হিসেবেই বর্ণনা করতে হয়, এবং তাতেও অনেক সময়ে জোর করে প্রয়োজনীয় ঘটনার অবতারণা করতে হয়। কিন্তু সেই জোর করার কোনও প্রয়োজন ঘটে না যদি অনেকগুলি বিশেষ ঘটনা একত্রিত করে একটি নির্বিশেষ দিনের বর্ণনা করা হয়। তেমনি ঘটনার স্থানের ব্যাপারে। মজুরদের কুটিরের দাওয়ায় তাদের নিজেদের আলাপ চলতে পারে, কিন্তু সেখানে রাজাও আসতে পারে না, সর্দারও সহজে পারে না। অথচ গল্পটা যদি সকলকে নিয়েই হয়, তাহলে ভিন্ন দৃশ্য করে মাঝে মাঝে ছেদ দিয়ে দুই পক্ষকে দেখাতে হয়। তাতে নাটকের রস ফিকে হয়ে যায়। তার চেয়ে সব প্রয়োজনীয় ঘটনাই যদি এক জায়গাতেই ঘটে, অবশ্য জোর জবরদস্তি না করে, তাহলে গল্পটার আসল সূত্র জমাট হয়ে প্রকাশ হয়। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নাটকটা অত্যন্ত সত্য হয়ে ওঠে, যদিও সাধারণভাবে বাস্তবানুগ থাকে না। আসল কথা হোল সত্যের গভীর চেহারাটা প্রকাশ করা। এও একটা উপায় এবং খুব দেশি উপায়। য়ুরোপীয় ভাস্কর একজন বিশেষ মানুষকে মডেল করে তাকে গড়ে তুলে তাকে দেবতার মতো করে। আর ভারতীয় ভাস্কর্য দেবতার মূর্তি গড়েছে কোনও বিশেষ মানুষকে মডেল করে নয়, মানুষের নির্বিশেষ ছাঁদকে কাব্যের প্রয়োজনে অতিরিক্ত করে। তাতেও যে দেবতার মূর্তি ফুটেছে সেটা কোনও অংশে গ্রিক ভাস্করদের তুলনায় হীন নয়, বরং আমাদের অনেকের কাছে বেশি প্রিয়। এও একটা পথ।

রবীন্দ্রনাথের নাটক তেমনি একটা ধরন। দেশি ধরন। এদেশের যাত্রায় লৌকিক রাজার লৌকিক কাহিনির মধ্যে অকস্মাৎ বিবেক এসে পড়ে। গান গায়, পরামর্শ দেয়। *কর্ণার্জুন* নাটকে নিয়তি এসে কর্ণের সঙ্গে কথা কয়। যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ের নাটক *দিগ্বিজয়ী*তে অত্যন্ত লৌকিক নাদির শাহ্-এর কাছে ভারতমাতা এসে কথা বলে, অভিসম্পাত দেয়। এই হোল আমাদের দেশের ধরন। এর জন্য লৌকিক চরিত্রকে ব্যাহত করা হয় না। অথচ অলৌকিক পাশে পাশেই থাকে। ঠিক তেমনি *রক্তকরবী*তে রাজাও আছে আবার ফাগুলাল-চন্দ্রা-গোকুলও আছে।

সুতরাং এ নাটকের দৃশ্যসজ্জাও তেমনি হবে। আমরা একটা ভেবে বের করলাম। অবশ্য ভাবনাটা প্রথম এলো গগনবাবুর ছবি থেকে। সেখানেও সিঁড়ি আছে। সেইটাকে মনে রেখে, এবং নিজেদের অর্থসামর্থের কথা মনে রেখে একটা মডেল করা হোল গোড়ায়। সেইটা সকলকে দেখিয়ে মহলা দেওয়া হ'তে লাগলো। কারণ আমাদের তো সামর্থ নেই যে স্টেজ ভাড়া ক'রে পুরো দৃশ্য সাজিয়ে নিয়ে তার ওপর রোজ রোজ মহলা দিই। মডেলটা তৈরি করার পর আর একটা জিনিস আবিষ্কার করা গেল যে এই দৃশ্যের মধ্যে যেখানে ইচ্ছে লোক দাঁড়ালেই একটা কম্পোজিশন হয়। একটাই দৃশ্য, সুতরাং এর এই রকম সচলতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য, একথা ঠিক যে নানান কারণে আজও আমরা আমাদের মনোমতো সজ্জা দিতে পারিনি।

এর পরে আলো। তাপস সেন হচ্ছেন আলোর ব্যাপারে একজন বিখ্যাত ব্যাপারী। আমাদের প্ল্যান তাঁর অত্যন্ত ভালো লাগল। আলোচনা হল বিভিন্ন মুড্ সম্পর্কে। এবং নাটকের চরিত্র সম্পর্কে। তারপরে সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দেওয়া হল তাপস সেনের ওপর। সাধারণ যে-কোনও নাট্যাভিনয়ের চাইতে *রক্তকরবী*তে অনেক বেশিসংখ্যক আলো ব্যবহার হয়। তবু আমাদের মনের আফশোশ যে আমাদের নিজেদের বাঁধা কোনও মঞ্চ নেই, থাকলে এই দৃশ্যসজ্জা এবং এই আলো অন্তত এর দ্বিগুণ ভালো হোত।

যাই হ'ক, ওদিকে মহলা চলছে। গোড়াতে, রবীন্দ্রনাথের যে ভাষায় রক্তকরবী লেখা সে ভাষা বলতে আমাদের ভীষণ অসুবিধে হচ্ছিল। অথচ *চার অধ্যায়*-এর ভাষা বলতে আমাদের এরকম অসুবিধে হয়নি। কিন্তু

এতে হঠাৎ মনে হয় ভাষাটা বুঝি বড্ডো বেশি কাব্যময়। অথচ সবটা কেবল কাব্য করবার নয়। প্রথমত, তাতে বক্তব্য সত্যের ঔজ্জ্বল্য ক'মে যায়, দ্বিতীয়ত সব চরিত্র তো একরকম জাতের নয়। তাহলে? কিছু লোক সুরে বলবে, আর কিছু লোক প্রাকৃত ঢঙে বলবে? সেটা আমাদের ভালো লাগে না। কারণ তাহলে যে চরিত্রগুলো সুরে বলবে লোকে মনে করবে তারা ঢঙ্ করছে। তাদের কথার কোনও দাম দেবে না।

এইরকম সময়ে একদিন নাটকটা একজন গেঁয়ো লোককে শোনানো হচ্ছিল। যেখানটায় চন্দ্রা বলে—''সর্দ্দারদাদা.....একবার বাড়ি যেতে ছুটি দাও!" সেইখানটা শুনে লোকটি হেসে ফেলে। জিজ্ঞাসা করলাম। বল্লে—''আমাদের দেশেঘরেও ঠিক ঐরকম ভাবে কথা বলে। বলে, 'অমুকদাদা আমার ছেলের চাগ্রীটা হবেনি?"

হঠাৎ আমাদের খেয়াল হোল, তাইতো বটে। এগুলো তো গ্রামেরই ভাষা। গ্রামে বলে তোমারে কিন্তু শহরে বলি তোমাকে। তোমারে-র ব্যবহার কেবলমাত্র কবিতায়। তাই ওইরকম কথা কেউ লিখলে আমাদের মনে হয় কাব্য করছে। অথচ ওটা কথোপকথনেরই ভাষা। তাই ব'লে এও নয় যে রবীন্দ্রনাথ গেঁয়ো কথার অনুকরণে সংলাপ লিখেছেন। গ্রাম্য কবির গানের ভাবে রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছেন এবং সে কথার মধ্যে মাধুর্য বেড়েছে, ব্যাপ্তি বেড়েছে। গ্রাম্য গানে একটা একঘেয়েমি আছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে সেই গান অনেক সচল হোল কিন্তু তার মিষ্টত্ব সম্পূর্ণ রইল। তেমনি প্রাক্ ইংরেজকালের আমাদের যে বাংলা ভাষা তাকেই আরো ব্যাপ্তি দিয়ে আধুনিক করে এই সংলাপের ভাষা। *চার অধ্যায়*-এর অতীন-এলা ইংরেজি শিক্ষিত শহুরে লোক, শেষের কবিতার ভাষাও শহুরে, সেখানে আমাদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু un-sophisticated লোকের পক্ষে হয়। তাইতো আজ লেখক মহলে এতো তাড়না যে, কী করে সেই ভাষা তৈরি করা যায়, যে-ভাষায় আমাদের আজকের দিনের সমস্ত সমস্যার কথা বলা যায় অথচ এমন করে বলা যায় যা সকলের বোধগম্য হবে। কেবল বোধগম্য নয়, গভীর হবে, ঝঙ্কার থাকবে। যে সব মহান কবিদের হাতে বাংলা ভাষা প্রথম রূপ পেয়েছে—যেমন বৈষ্ণব কবিদের—তাঁদের ভাষা আজও আমাদের মুগ্ধ করে। মনের এতো গভীরে গিয়ে ঘা দেয় যে আমরা যেন কী হয়ে যাই। অথচ সেই ভাষা আজ আমরা ব্যবহার করতে পারি না। আজকের সমস্যা এতো অন্য, আজকের বাঁচার পদ্ধতি এতো অন্য। সেদিনের ভাষা সেদিনকার সব লোক বুঝতো, অথচ আজকের ভাষা কেবল ইংরেজি শিক্ষিতরাই বোঝে। অতএব, যদি সেই ভাষার শিকড় থেকে রস নিয়ে আমরা আজকের দিনের কথা বলতে পারি, ভিনদেশি মনোভাব না নিয়ে দেশি লোকের মতো দেশি সমস্যার কথা বলতে পারি, তাহলে আবার বাংলা ভাষা একটা বিরাট স্থানে পৌঁছুতে পারে। এরই প্রথম চেষ্টা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। দেশের প্রতি, দেশের লোকের প্রতি যে-লোকের ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম আর গভীর! যে-লোক শুনেছি যৌবনকালে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম গ্রাম্য সমবায় সমিতি গড়বার চেষ্টা করেছেন। সেই লোক।

এই সমস্ত কথা মনে হওয়ার জন্যই আমরা কথা বলার ধরনটা পালটালাম। শহরে কথাবার্তার মধ্যে একটা inhibition আছে, একটা দেওয়াল আছে। কিন্তু এই সমস্ত সংলাপ অত্যন্ত খোলামেলা, যা বলে তা পুরো হৃদয় দিয়ে বলে। দরাজ দিল, দরাজ স্নেহ, দরাজ গলা। বলে বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না, তবে আমরা চেষ্টা করেছি সৎভাবে মন খুলে বলতে। তাতেই কাব্যিক না হয়ে, ন্যাকামি না করে, সত্য কাব্য ফুটতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কাব্যিক না। তাঁর কাব্যে তিনি বারবার সাধারণ কথোপকথনের সুর এনেছেন। এবং সেই জন্যেই সেগুলো ঝল্‌মল্ করে পাঠকের সামনে। 'যে ক্ষুধা চোক্ষের মাঝে, যেই ক্ষুধা কানে'-এ কবিতা তো প্রায় গদ্যের মতো করে পড়বার। কাব্যিক হলে কেবলমাত্র অবাস্তব সুরই থাকতো, এগুলো কাব্য ফোটে আমাদের দৈনন্দিন সুরের মধ্যে দিয়ে। নইলে 'কখন ছাগল তুই চরাবি' বলে গান হতে পারে কখনও? আমরা যখনই আমাদের

ক্ষুদ্র মনের অস্বাভাবিক সুর লাগিয়ে কাব্যটাকে খুব আগ বাড়িয়ে ফোটাবার চেষ্টা করি তখনও কাব্য খর্ব হয়, কাব্যিক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও মারা পড়েন, আর দর্শক সাধারণও তৃপ্ত হয় না। অনেক দিনের অনেক চেষ্টার পর তিনি সহজ সুরে কথা তৈরি করেছেন, যে-সহজতা সকল মহৎ শিল্পে অবশ্য প্রয়োজনীয়। সহজতার দিকে। তা, না করে যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের হয়ে নীচে মোটা মোটা পেন্সিলের দাগ দিয়ে কাব্য বোঝাবার চেষ্টা করি, তাহলে তাতে রবীন্দ্রনাথকে ছোটো করা হয়, নিজেদেরও উন্নত করিনা।

অবশ্য, একথা স্বীকার করি যে যতোটা সুন্দর করে আমরা কথাগুলো বলবো ভাবি এখনও ততো সুন্দর করে বলতে পারি না। তবে, কাব্যিক মনোভাবের ধোঁয়ায় অন্ধ হয়ে লোক যখন রক্তকরবীর মধ্যে জীয়ন্ত মানবিক হাসি, ঠাট্টা, দুঃখ দেখতে পাচ্ছিল না, বহুরূপী তখন শ্রদ্ধার সঙ্গে চোখ খুলে দেখেছে বলে সেইগুলো কিছুটা দেখতে পেয়েছে। আরও বুদ্ধি থাকলে আরো পারতো।

'বহুরূপী' ১০২/অক্টোবর ২০০৪, বিশেষ 'রক্তকরবী' প্রযোজনা সংখ্যা পৃ ২৯-১২

তথ্যঋণ :

১। **রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক**, তৃতীয় খণ্ড।। ১৯১৮-১৯৩৪ : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়/ বিশ্বভারতী।

২। **রবিজীবনী,** নবম খণ্ড : প্রশান্তকুমার পাল/ আনন্দ পাবলিশার্স

৩। **রবীন্দ্র রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড (গ্রন্থ পরিচয়)**: পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক মে, ২০০১-এ প্রকাশিত

৪। **রক্তকরবী** (দশটি খসড়ার পাণ্ডুলিপি সংবলিত সংস্করণ): সংকলন ও সম্পাদনা: প্রণয়কুমার কুণ্ড/ বিশ্বভারতী

৫। **রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ** ২ : প্রমথনাথ বিশী/ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

৬। **ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (দ্বিতীয় খণ্ড):** নেপাল মজুদমরা/দে'জ পাবলিশিং

৭। **উৎপল দত্ত গদ্যসংগ্রহ** (প্রথম খণ্ড), সম্পাদনা: শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়/ কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী

৮। **কবির অভিপ্রায়** : শঙ্খ ঘোষ/ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৯। **কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক** : শঙ্খ ঘোষ/ দে'জ পাবলিশিং

১০। **নাটক রক্তকরবী** : শম্ভু মিত্র/ এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স

১১। **রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ** : অভীককুমার দে/ পুস্তক বিপণী

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত **রক্তকরবী Red Oleanders–শতবর্ষে পত্রিকাপাঠ** : সম্পাদনা—দেবাঙ্গন বসু/ পার্চমেন্ট

পত্র-পত্রিকা :

১। '**মিরান্দা**' বিশেষ 'রক্তকরবী' সংখ্যা (জানুয়ারি ২০০৩)

২। '**বহুরূপী**', সংখ্যা ৭০ (অক্টোবর ১৯৮৮)

৩। '**বহুরূপী**' সংখ্যা ১০২ (বিশেষ 'রক্তকরবী' প্রযোজনা সংখ্যা) অক্টোবর ২০০৪

৪। '**দেশ**', ২ এপ্রিল ২০২৫ (প্রচ্ছদ কাহিনি: রক্তকরবী শতবর্ষ পেরিয়ে)

৫। অন্যভাবে পড়ি রক্তকরবী: শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, **শারদীয় 'দেশ'** ১৪৩২ (২০২৫)

৬। '**কৃত্তিবাস**', শতবর্ষে রক্তকরবী (এক ও দুই), ১মে ও ১৬ই মে, ২০২৫

৭। '**নন্দন**' (প্রসঙ্গ রক্তকরবী), ৪ জানুয়ারি২০২৫

A Well Wisher

সম্পাদক ঃ অম্লান দে

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল

- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯